ভিখারী

সামাজিক উপন্যাস।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত।

"It is true that a little philosophy inclineth Man's mind to atheism, but depth in philosophy bringeth men's minds about to religion" *Bacon.*

"We should always be in no other than the state of a penitent, because the most righteous of us is no better than a sinner."

"Advice should proceed fron a desire to improve, never from a desire to reproach." *Burke.*

"There is a soul of goodness in things evil
"If one had power to distil it out." *Shakespeare.*

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

সমর্থকোষ প্রেসে, সেন এণ্ড সন্‌স্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত,

ও ২১০।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বৈশাখ—১২৯৫।

All rights reserved.

উৎসর্গ।

স্নেহময়—শ্রীযুত বাবু অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ভাই অমৃত,

তুমি নির্ব্বোধের ন্যায় কাঙ্গালের কুটীরে প্রবেশ করিয়াছ। কালের দুর্জ্জয় পরাক্রমে দিন দিন আমি কাঙ্গাল হইয়া পড়িতেছি। আমি নানা প্রকার আন্দোলনের স্রোতে গা ঢালিয়া চলিয়াছি, আমার গৃহ-ভাণ্ডার যে একেবারে শূন্য, সে দিকে দৃক্‌পাত্ নাই। প্রেম বল, ভক্তি বল বা বিশ্বাস বল, এ সকলের অভাবে, দেখ, আমি দিন দিন কেমন মলিন হইয়া পড়িতেছি! আন্দোলনে পড়িয়া ভক্তি গেল, শিক্ষা গেল, বিনয় গেল, ভালবাসা গেল, সকল গেল,—আমি একেবারে দরিদ্র হইয়া পড়িলাম। পৃথিবীর সকল শিক্ষার মূলশিক্ষা মানবহৃদয় অধ্যয়ন, সকল উদ্দেশ্যের সার উদ্দেশ্য পরের জন্য জীবন সমর্পণ। বর্ত্তমান আন্দোলনে আমার নিকট এ সকল বাতুলের কথা বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন আমি পাপীকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি,— অহঙ্কারে আত্মা স্ফীত হইয়াছে। সংসারের ক্ষণস্থায়ী যশ মানের আশা-কুহকে ভুলিয়া আমার হৃদয়ের স্বর্গীয় অমূল্য আভরণ সকল বিক্রয় করিয়াছি,— আমি দরিদ্র হইতেও আজ দরিদ্র তুমি নির্ব্বোধের ন্যায় কাঙ্গালের ঘরে পদনিক্ষেপ করিয়াছ।

আমার এই দুরবস্থার সময় আমি একটী সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছি,-তোমার পবিত্র স্নেহ, কি নির্ম্মলভাব ধারণ করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে। আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে,—কিন্তু পাইয়াছি, কেবল তোমার ভালবাসা। এ ভালবাসাও আমার রাখিবার স্থান নাই, কারণ আমার হৃদয় প্রেমশূন্য। তুমি বিজ্ঞ,তুমি কি না বুঝিতেছ? আমার হৃদয়ের মধ্যে যে দারুণ অনুতাপাগ্নি দিন দিন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, মনে হয়, এ অগ্নি আমার মনের সকল আভরণ দগ্ধীভূত করিয়া ফেলিবে। আমার অন্তরের পিপাসা এ জন্মে আর মিটিল না! জীবনের আর সকল বাসনার কথা দূর হউক, আমি মানুষকেও ভালবাসিতে পারিলাম না;—আমি প্রেমশূন্য নারকী। পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ যখন তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করি, তখন দেখি নিঃস্বার্থ ভাবে আমি কাহাকেও ভালবাসিতে পারি নাই।—আমি বন্ধুশূন্য, প্রেমশূন্য,—আমিই সংসারের যথার্থ দরিদ্র। তোমার নির্ম্মল ভালবাসার সহিত বিনিময় করিতে পারি, আমার হৃদয়-ভাণ্ডারে এমন কিছুই নাই!!

আমি হিন্দুস্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ;—অতিথির মন তুষ্ট করা ভারতের সকল ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম। তুমি দরিদ্রের কুটীরে আসিয়াছ ;—কিন্তু আমি কি দিয়া তোমার মন রাখিব ? তুমি সংসারের কত অমূল্য রত্নকে হৃদয়ের ভূষণ করিয়া রাখিয়াছ ; রত্নের আর তোমার অভাব নাই। যে সংসারের বহুল রত্নের অধিকারী, তাহার নিকট সামান্য মৃৎখণ্ড নিতান্ত উপেক্ষনীয়, তাহা জানি। কিন্তু দরিদ্র তোমাকে আর দিবে ? তাই বলিতেছিলাম, নির্ব্বোধের ন্যায় তুমি দরিদ্রের কুটীরে আসিয়াছ।

আজ তোমার নিকটে এতগুলি কথা বলিতেছি কেন ? তোমার হৃদয় আমি চিনিয়াছি,—তোমাকে আমি বুঝিয়াছি।—বুঝিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ডের সকল আভরণ খুলিয়া রাখিয়া তুমি আমার প্রদত্ত সামান্য মৃৎখণ্ডকেও সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিবে। যদি আমার এ অনুভূতি ঠিক হইয়া থাকে, তবে ভাই, সকল রত্ন পরিত্যাগ কর,—কালিদাস, সেক্ষপিয়র, স্কট, রেনল্‌ডস ডিকেন্স, থেকারি, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, সকল ভুলিয়া যাও। দরিদ্রের কুটীরে রত্নের অহঙ্কারী হইয়া আসিও না ;—সকল ভুলিয়া যাও। তারপর এই সামান্য মৃৎখণ্ডকে ভূষণ করিয়া হৃদয়ে পরিধান কর। যখন তুমি নির্ব্বোধের ন্যায় দরিদ্রের কুটীরে প্রবেশ করিয়াছ,—তখন বলপূর্ব্বক তোমার সমস্ত রত্ন কাড়িয়া এই সামান্য মৃৎখণ্ডকে পরাইয়া দিলেই তোমার উপযুক্ত দণ্ড হয়, লজ্জায় তোমার মুখ মলিন হয়। আজ আমি তাহাই করিব।

আমি যে মৃৎখণ্ডের কথা বলিতেছিলাম, তাহা এই 'ভিখারী' নামে খ্যাত হইয়াছে। মৃত্তিকার জিনিসে আর কি থাকিতে পারে ? 'ভিখারী' মৃত্তিকার দ্বারা গঠিত, তাই মৃৎখণ্ড, ইহাতে আর কিছুই নাই। আজ বলপূর্ব্বক তোমাকে এই মৃৎখণ্ড উপহার দিলাম ;—সংসার হাসিবে, তুমি হাসিবে, তাহা জানি। তুমি হাসিবে, তাহাই আমি দেখিতে চাই ;—আমি সংসারে কেমন বিনিময় করিতে শিখিয়াছি, ইহা বুঝিয়া লোকে ঠাট্টা করিবে, তাহাই শুনিতে চাই। আজ বলপূর্ব্বক 'ভিখারী'-মৃৎখণ্ড তোমার নামে উৎসর্গ করিলাম, তুমি মৃদু মৃদু ভাবে একবার হাস,—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু বান্ধব সকলে সায় দিক্। সে চিত্র দেখিয়া দরিদ্র সুখী হউক।

আনন্দ-আশ্রম।
মাঘ—১২৮৮।

তোমার স্নেহ-ভিখারী,
শ্রীদেবীপ্রসন্ন—

ভিখারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নদী-বক্ষে।

আষাঢ় মাস,—মেঘ হতে অবিশ্রান্ত জল নামিতেছে। টিপ্ টিপ্ টিপ্;—দিবারাত্রি বৃষ্টি ঝরিতেছে। বাদ্‌লায় বাদ্‌লায় পথঘাট সব কর্দ্দমময় হইয়া গিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিক জলময় হইয়া উঠিয়াছে। জলে জলে নদ,নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি আহ্লাদে উথলিয়া উঠিতেছে;—আর তীরের বাঁধ মানে না,—মত্ত হইয়া তীর অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। পাহাড় পর্ব্বতের সন্নিকটস্থ যে সকল নদী দুমাস পূর্ব্বে শুষ্কপ্রায় ছিল,আজ সে সকলের তেজের পরিমাণ করা যায় না। বক্ষে প্রস্তর, বৃক্ষ প্রভৃতি ধারণ করিয়া স্ফীত-কলেবরে অবিশ্রান্ত নদী-স্রোত চলিয়াছে। কোথায় চলিয়াছে? সাগর-সঙ্গমে। এত উৎসাহ, এত উদ্যম, এত তেজ কি চিরকাল স্থায়ী হইবে? আজ আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আর কি গগনে সূর্য্যোদয় হইবে না;—আর কি এ আকাশের মেঘের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে না;—নদী, সরোবর প্রভৃতি সকলেই জানে, এ অবস্থা স্থায়ী নহে;—আবার উৎসাহ কমিয়া যাইবে, আবার শূন্য বক্ষে এক দিন বালুকণা রাজত্ব করিবে। মেঘ সম্বৎসর সমভাবে উৎসাহ দিবে না, তাহা ঠিক, কিন্তু তাতে আজ কি? ভাবী নৈরাশ্যের চিত্র স্মরণ করিয়া কে বর্ত্তমান সুখের সময় ক্রন্দন করিতে বসে? আকাশ হইতে ক্রমাগত মেঘ খসিয়া পড়িতেছে, নদ নদী ভবিষ্যৎ ভুলিয়া, বর্ত্তমান সুখে উথলিয়া, তীর উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে। কার সাধ্য থামায়!

আষাঢ় মাসে এক দিকে এত আমোদ, এত উৎসাহ; কিন্তু অন্য দিকে যারপর নাই কষ্ট। অসহ্য গ্রীষ্ম-যাতনায় লোক,প্রাণী কষ্ট পাইতেছিল,এক দিন দুদিনের জলে সে কষ্ট দূর হইয়াছে, লোকের বৃষ্টির সাধ মিটিয়াছে। পথে

চলা যায় না; হাঠ বাজার আর মেলে না। আহারের দ্রব্যাদি ঘটে না। মাটের ঘাস জলে ডুবিয়া গিয়াছে, গরু বাছুর আর চরিতে পায় না, আহার পায় না। মৎস্য নূতন জল পাইয়া জীবন পাইয়াছে, কিন্তু মানুষ ও প্রাণীর আহার মিলে না। ঘরের চাল দিয়া জল পড়িয়া পড়িয়া বিছানা কাপড় প্রভৃতি সব ভিজিয়া রহিয়াছে,—রৌদ্র অভাবে লোকের অশেষ কষ্ট। স্ত্রী লোকের গৃহকার্য্য সকল সমাধা করিতে হইবে, সমস্ত জল তাহাদের মস্তকে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। কর্দ্দমে পথ দুর্গম,নদী-পথে দাঁড়ী মাজীরা ভিজিয়া ভিজিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে,হাত পা শীতল। কি কষ্ট? লোকের কোন কার্য্যই স্থগিত থাকিবার নয়, কারণ অর্থই জীবন পথের মূল প্রবর্ত্তক। কাজ করিতেই হইবে, নচেৎ চলে না। এত কষ্ট সহ্য করিয়াও মানুষ কাজে ব্যস্ত হইতেছে। বর্ষাকালে কত কষ্ট!

এই দৃশ্যে আমরা আর একটী দৃশ্য মিলাইব। এই আষাঢ় মাসে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে, লোকের পক্ষে সহ্য করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই দুর্দ্দিনেও এক খানি নৌকা নদী-পথে চলিতেছে। কলিকাতায় আসিবার নদী-পথ, কিম্বা অন্য কোন বাণিজ্যোদ্দেশে যাতায়াতের পথের কথা বলিতেছি না; কারণ সে সকল পথে স্বার্থের জন্য অবিরত নৌকা যাতায়াত করিয়া থাকে। একটী সামান্য গ্রামের নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র নদী দিয়া এক খানি নৌকা যাইতেছে। নৌকা কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইবে, তাহা আমরা এখন বলিব না। এই নৌকায় দুই জন আরোহী, দুইজনই অল্পবয়স্ক;—একটী সুস্থ আর একটী বিষম জ্বর রোগে পীড়িত। সমস্ত আকাশে জলকণা বায়ুর সহিত উড়িয়া বেড়াইতেছে,—সমস্ত শীতল, কিন্তু এই নৌকার ভিতরে এক জনের শরীর হইতে যেন অগ্নিকণা নির্গত হইতেছে। সুস্থ যুবক পীড়িত বন্ধুর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছেন।

বাবুর পীড়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, নৌকার মাজীরাও তাহা বুঝিতে পারিতেছে। তাহারা বাবুর বিপদে চতুর্দ্দিক আঁধার দেখিতেছে। কিন্তু তাহারা কি করিবে, একমাত্র উপায় বাবুকে বাড়ীতে উপস্থিত করা। তাই মাজীরা বৃষ্টি না মানিয়া অবিরত সঘন দাঁড় ফেলিয়া নৌকা চালাইয়া যাইতেছে।

নৌকায় কোন প্রকার ঔষধ নাই, পথ্য নাই। আজ ৫।৬ দিন যুবকের

জ্বর হইয়াছে, ইহার মধ্যে কোন প্রকার ঔষধ মিলে নাই। প্রথম দুই দিন অবহেলায় গত হইয়াছে. তৃতীয় দিন হইতে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বন্ধু এই বৃষ্টির মধ্যেও অনেক গ্রামে কবিরাজ অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু নদী-তীর প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর লোকের বাস, কোন স্থানেই কবিরাজ মিলে নাই। অদ্য রোগী নিতান্ত অস্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত। পার্শ্বস্থ বন্ধু সকলি বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু কি করিবেন? সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা মস্তকে লইয়া আবার নদী-তীরস্থ গ্রামে ঔষধ কিম্বা কবিরাজ অন্বেষণে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। মাঝীরা আজ্ঞানুসারে একটী ছোট নদীর তীরে নৌকা খানি বাঁধিল। বন্ধু নৌকা হইতে নামিয়া গ্রামে চলিলেন।

উপায়হীন বন্ধু এবাড়ী হইতে ওবাড়ী, ওবাড়ী হইতে অন্য বাড়ী, এই প্রকার গ্রামের বাড়ী বাড়ী, দ্বারে দ্বারে যাইয়া কাতরস্বরে 'এ গ্রামে বৈদ্য আছে কি না,' জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গ্রামের সকলেই দরিদ্র, এ গ্রামে বৈদ্য থাকিবার সম্ভাবনা কি? সকলেই বলিল, এ গ্রামে বৈদ্য নাই, কিন্তু এ স্থান হইতে এক প্রহরের দূরে ভদ্র লোকের আবাস আছে, সেখানে বৈদ্য ও কবিরাজ আছে। বন্ধু কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া ঠিক পাইলেন না। ক্রমে ক্রমে গ্রামের একটী একটী লোক আসিয়া এক স্থানে একত্রিত হইতে লাগিল। এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যেও কৃষকশ্রেণী এই অসহায় যুবকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া এক স্থানে একত্রিত হইল। সকলেই ভাবিতে লাগিল, কি উপায়ে এই বিপন্ন যুবকের উপকার করা যাইতে পারে। অবশেষে সকলেই ঠিক করিল যে, রোগীকে এক বাড়ীতে উঠাইয়া, বৈদ্য আনিতে লোক পাঠান হউক। বন্ধু ইতস্ততঃ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে কৃষকদিগের মধ্য হইতে এক জন কৃষক মোটা ভাষায় বলিল,—"মহাশয় ভাবেন কি, আমি এই বৈদ্য আনিতে চলিলাম, আপনি রোগীকে সাবধানে আমার বাড়ীতে তুলিয়া আনুন। বন্ধু কৃষকের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং পীড়িত বন্ধুকে অগত্যা সেই কৃষকের বাড়ীতে তুলিয়া আনিতে নৌকায় গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ কি কল্পনার চিত্র ?

অপরাহ্ন ৪টা বাজিয়া গিয়াছে, কৃপানাথ বাবু আপন পুস্তক বন্ধ করিয়া সামান্য একখানি উড়নী গায়ে দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছেন। সমস্ত দিবস কি পাঠ করিয়াছেন, স্মৃতিপথে ক্রমাগত তাহাই বারম্বার ভাবিতেছেন। "স্বদেশের হিতের জন্য যাহার জীবন, মৃত্যু, তুমি তাহাকে ভয় দেখাইয়া কি বিচলিত করিতে পার ?" এই কথাটী যেন অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে, আর কি পাঠ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ হইতেছে না। সে দিন আর যাহা অধ্যয়ন করিয়াছেন, সে সকল ভুলিয়া গিয়াছেন, কেবল এই একটী পদ অন্তরে বাহিরে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। স্বদেশের জন্য যাহার জীবন, তার আর মৃত্যুর ভয় কি, এই কথাটী যে মহাত্মা বলিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে কৃপানাথ বাবুর একান্ত ইচ্ছা হইতেছে, ভাবিতেছেন, কি প্রশস্ত হৃদয়ের কথা ! আমি আছি, ক্ষুদ্র মানব নীচ হৃদয় লইয়া জীবন কাটাইতেছি, আমার পক্ষে এপ্রকার উন্নত জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব ভেদ করা অত্যন্ত অহঙ্কারের কথা ! স্বদেশ আর আমি, ইহাতে বিভিন্ন কি ? কিছুই নয়। কারণ আমি আছি, তাই আমার স্বদেশ ; আর আমার স্বদেশ ছিল, তাই আমি আছি। আমার স্বদেশ না থাকিলে আমার অস্তিত্ব থাকিত না, আর আমি না থাকিলে 'আমার দেশ,' একথাও কেহ বলিত না। সুতরাং আমি এবং স্বদেশ একাত্মক কথা। আমার হাত, আমার পা, আমার রক্ত, আমার মাংস যেমন আমার ; আমার দেশ তেমনি আমার। আমার কথা বলিলে আমার স্বদেশের কথাও সেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝায়। আমি যদি মানব জাতির জঘন্য শ্রেণীতে মিলিয়া যাই, আমার স্বদেশের নামে কলঙ্ক রটিবে। আমার স্বদেশের নামে কলঙ্ক রটিলে আমার আর মুখ দেখাইবার স্থান থাকিবে না। আমার রোগের ফল যেমন শরীরের রক্ত মাংস ভোগ করে, আমার কলঙ্কের বোঝা আমার স্বদেশের বহন করিতে হয়। সুতরাং আমি এবং আমার স্বদেশ অভিন্ন কথা। স্বদেশই যাঁহার জীবন, স্বদেশই যাঁহার প্রাণ, স্বদেশ ভিন্ন তাঁহার বাঁচিবার আশা কোথায় ? এই

স্বদেশের হিতসাধন করিবার সময় যদি মৃত্যুও আগমন করে, তবে তাহাও এহেন মানবের নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। কি উদার কথা, কি মহত্ত্বের পরিচয়!! এই কথা ভাবিতে ২ কৃপানাথ বাবু রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন, মস্তিষ্ক অত্যন্ত বিলোড়িত হইতেছিল ; তাহার স্বীয় জীবনের সহিত এই মহৎ বাক্যের তুলনা করিয়া আপনার প্রতি নিতান্ত ধিক্কার জন্মিতেছিল। রাস্তার বিষয় তাহার স্মরণ নাই, কোথায় যাইতেছেন, তাহা ধারণা নাই। মলিন উড়নী গায়ে, একজোড়া চটী জুতা পায়ে, ভাবিতে ২ কৃপানাথ বাবু অনেক-দূর গিয়াছেন। অনেকদূর যাইয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন, যেদিকে প্রত্যহ ভ্রমণ করিতে যাইতেন, অদ্যও সেই দিকেই যাইতেছেন। আবার অন্যমনস্ক হইয়া চলিলেন।

কলিকাতার দুর্গের উত্তরে ইডেন উদ্যান। অপরাহ্নে বৃক্ষের ভিতর দিয়া সূর্য্য-রশ্মি পশ্চিম গগনে যেন অন্ধকারে লুক্কায়িত হইতে যাই-তেছে। ইডেন উদ্যানের কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে! চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু পক্ষীর স্বরে উদ্যান প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অদূরে পল্টন বাদ্য নিস্তব্ধ সময়ের গাম্ভীর্য্য বিনাশ করিতেছে। কৃপানাথ বাবু অন্যমনস্ক, সুতরাং স্বাধীনভাবে উদ্যানের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া দুর্গের পশ্চিমদিকে গমন করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে একটী প্রশস্ত পথ, এবং তাহার সংলগ্ন, একটু পূর্ব্বে, একটী অপ্রশস্ত সুন্দর ইষ্টকময় রাস্তা। সেই রাস্তার দুই পার্শ্বে নব দুর্ব্বাদল অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত। এই অপ্রশস্ত রাস্তাটী এত সুন্দর যে, পথিকের এই রাস্তায় ভ্রমণ করিতে সহসাই ইচ্ছা হয়। কৃপা-নাথ বাবু স্বাধীন ইচ্ছার তাড়নায় যাই স্বাধীন ভাবে এই রাস্তায় পদ নিক্ষেপ করিলেন ; অমনি পশ্চাৎ দিক হইলে দুই জন প্রহরী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "কালবাঙ্গালীর এ পথে বেড়াইবার অধিকার নাই, তোমাদের জন্য ঐ বড় পথ পড়িয়া রহিয়াছে, যাও।"

কৃপানাথ বাবু সহসা চমকিত হইলেন, এ চিত্র যেন তাঁহার নিকট স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল, ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া বলিলেন,— এ রাস্তায় আমাদের ভ্রমণের অধিকার নাই কেন?

প্রহরী (চৌকিদার) উত্তর করিল, কারণ জানি না, শীঘ্র যাও।

কৃপানাথ বাবু দেখিলেন, একটু দূরে দুটী বাঙ্গালী সেই রাস্তায়ই ভ্রমণ করিতেছেন, বলিলেন, ঐ যে বাঙ্গালী বাবুরা এই রাস্তায় রহিয়াছেন।

প্রহরী।--তোমার কাপড় পরিষ্কার নহে।

কৃপানাথ।—তাতে কি? আমিও ত বাঙ্গালী।

প্রহরী।—অধিক কথার দরকার কি, ঐ সার্জ্জন আস্‌তেছে, এখনই মার খেয়ে যেতে হবে।

কৃপানাথ বাবু সাহেব আসা পর্য্যন্ত একভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সাহেব আসিলে তাহার নিকট সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন, সাহেব কর্কশস্বরে বলিলেন, "নেকালো হিয়াছে।"

কৃপানাথ বাবু নিতান্ত উগ্র প্রকৃতির লোক নহেন, তাঁহাকে দেখিলেই দয়া হয়। তিনি ভাবগতিক দেখিয়া আস্তে আস্তে সেই রাস্তা হইতে ফিরিলেন। অমনি চতুর্দ্দিকের সাহেবেরা হাতে তালি দিয়া উঠিল। কৃপানাথ বাবু মনে মনে ভাবিলেন, স্বদেশে যাহাকে বিদেশীর ন্যায় বাস করিতে হয়, তাহার নিকট মৃত্যু দুঃখের কি? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, হয় এই দৃশ্যকে রূপান্তরিত করিব, না হয় মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

দূরে এক খানি গাড়ীতে একটী ইংরেজ মহিলা বসিয়া এই ঘটনার আদি অন্ত নিরীক্ষণ করিলেন। কৃপানাথ বাবু নিতান্ত অপমানিত হইয়া যখন বড় রাস্তায় ফিরিয়া আসিলেন; তখন উক্ত মহিলার মনে অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি কৃপানাথ বাবুর নিকট গাড়ী লইয়া যাইতে গাড়োয়ানকে বলিলেন, এবং আপনি বাবুর হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া উপবেশন করাইলেন। কৃপানাথ দুঃখে, রাগে, অপমানে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। উক্ত মহিলা আপন বাসস্থানে গাড়োয়ানকে গাড়ী হাকাইতে আদেশ করিলেন। গাড়ী বিদ্যুতের ন্যায় চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভাই ভগ্নী।

হোসেনপুরের গঙ্গাগোবিন্দ গোস্বামীর কন্যাটী ৭ বৎসরের সময় বিধবা হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ের একটী পুত্র এবং একটী কন্যা। পুত্রটী

বাল্যকাল হইতে ইংরাজি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন; তাহার নাম বিজয়গোবিন্দ গোস্বামী। বিজয়ের মাতুলের যত্ন না থাকিলে কখনও তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইত না, কারণ গোস্বামী বংশে যে দুই চারিটী লোক ইতিপূর্ব্বে ইংরাজি অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সমাজে অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া অবশেষে এক-ঘরে হইয়াছেন। গঙ্গাগোবিন্দ গোস্বামী একটু বিচক্ষণ লোক হইলেও, দেশের সকল লোকের বিরুদ্ধে কোন একটা কাজ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। এই কারণে, বিজয়গোবিন্দকে বাল্যকাল হইতে তাহার মাতুলালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন; জানিতেন, বিজয়ের মামা বিজয়কে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ত্রুটী করিবে না। বিজয়ের মাতুল লোকনাথ উপাধ্যায় কলিকাতার কোন হউসে ১৫০৲ টাকা বেতনে চাকুরি করিতেন। যখন বিজয়ের ভগ্নী বিধবা হয়, তখন তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতে ভর্ত্তি হইয়াছেন। বিজয় অতি উৎকৃষ্ট বালক, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৮৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগ্নীর জীবনের এই দারুণ শোকচিহ্ন তাঁহার অন্তরে বিষবৎ দংশন করিল। তিনি দিবারাত্রি ভগ্নীর বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে মলিন এবং জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিলেন।

গিরিবালা এখনও বালিকা, সে আনন্দে হাসে, আনন্দে বেড়ায়। তাহার নয়নের কোণে এখনও প্রভাত-নক্ষত্রের ন্যায় ঈষৎ হাস্য চমক চমকে খেলে। গিরিবালা পিতা-মাতার অত্যন্ত আদুরে মেয়ে; তাঁহাদিগের হৃদয়ে এই দারুণ শোক-শেল বিদ্ধ হইয়া অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা অতি সাবধানে এই দারুণ শোক গোপন করিয়াছেন। ভয় এই, পাছে তাঁহাদিগের ক্রন্দন দেখিয়া গিরিবালা কাঁদিয়া উঠে। তাঁহারা আর সব সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু মেয়ের চখে জল দেখিতে পারেন না। গিরিবালার এখনকার সামান্য ক্রন্দন তাঁহাদের সহ্য হয় না; কিন্তু সমাজের ঘোরতর অত্যাচারে যে জন আজন্ম চক্ষুর জল ফেলিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, দুই চারিদিন, তাহার চখে জল পড়া না দেখিলে কি? কিন্তু হতভাগ্য পিতা মাতার মন তবু বুঝ মানে না; তাঁহারা মনে করেন, গিরি যদি আজ না কাঁদে, তবে কাল কাঁদিবে না, ক্রমে ক্রমে যখন সকল ক্ষত পুরিয়া যাইবে, তখন আর মোটেই কাঁদিবেই না। মূর্খ পিতা মাতা জানে না যে, সকল ক্ষত পুরিয়া যাইতে পারে, কিন্তু গিরিবালার জীবনের এই বিষম ক্ষত পুরিবার ঔষধ দেশে নাই।

গিরিবালার মুখহাসি ভরা, দেখিলেই বোধ হয় যেন একটী মৃণালে একটী পদ্ম ফুটীয়া রহিয়াছে। সে মুখখানি অতি পবিত্র, অতি নিষ্কলঙ্ক, দেখিলেই বোধ হয় গিরিবালার মুখখানি যেন বিধাতা বিশেষ ভাবে চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন। এমন লোক নাই, গিরিবালাকে দেখিলে যাহার মনে ভালবাসার উদ্রেক না হয়। গিরিবালার এই পবিত্র ও সুন্দর দেহে একটী কালিমার রেখা পড়িল। বিধাতাও যদি সমাজের লোকের ন্যায় নিষ্ঠুর হইতেন, তাহা হইলে এই প্রস্ফুটিত কোমলকে একেবারে শোভাহীন করিতেন ;—গিরিবালার সৌন্দর্য্য অপহরণ করিতেন। কিন্তু বিধাতার নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় এবং ন্যায়দণ্ডে তুলিত। গিরিবালার সুখের দিন গিয়াছে, তবুও মুখের সে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তবুও মুখভরা হাসি মুখের সে সৌন্দর্য্যকে কত রঞ্জিত করিয়া রহিয়াছে! বিধাতার লীলা কে বুঝিবে !!

আজ কাল গিরিবালা যখন এ বাড়ী ও বাড়ী বেড়াইতে যায়, তখন কেহ কেহ দুই একটী কেমন কেমন কথা বলে। এক দিন সে হরিদের বাড়ী গিয়াছে, সেখানে বিপিনের স্ত্রী গিরিবালাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল, গিরিবালা কিছু না বুঝিতে পারিয়া মায়ের নিকটে আসিয়া সে কথা বলিল। আর এক দিন সে রাস্তায় ছোট মেয়েদিগের সহিত খেলা করিতে গিয়াছে, সেখানে গিরিবালাকে লক্ষ্য করিয়া এক বৃদ্ধা বলিয়া গেল,—"বিধবা মেয়েটা আবার খেল্‌তে এসেছে।" গিরিবালা এ কথা শুনে এটু মর্ম্মে বেদনা পাইয়া মায়ের কাছে বলিল, মাতা বলিলেন যে, "এরূপ কথা সে আর কাহাকেও বলিয়া থাকিবে।" আর এক দিন খেলিবার সময়ে একটা মুখরা মেয়ে বলি,'না গিরি, তুমি আমাদের সঙ্গে খেল্‌তে এসো না, আমার মা বলেছেন তোমার সহিত খেলা কর্‌লে আমরাও বিধবা হব।" গিরিবালা একটু দুঃখিত হয়ে একথার উত্তর দিল,— "কেন ভাই, আমাকে এরূপ কথা বল কেন? আর কখন ত ওরূপ বল নাই?" তাহাতে সে বলিল,—মা বলেছেন, তুমি বিধবা হয়েছ।

গিরিবালা একথা শুনিয়া যত কষ্ট না পাইল, সঙ্গিনী মেয়েরা তাহার সহিত খেলিতে চাহিল না, ইহাতে তদপেক্ষা অধিক কষ্ট পাইল। সে তৎক্ষণাৎ বাড়ী আসিয়া মায়ের নিকট সব কথা বলিল। মাতা দেখিলেন, সকল কথা গোপনে রাখা বিষম দায় হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে, গিরিবালাকে আর পাড়ায় যাইতে দেওয়া হইবে না। এই প্রকারে এই বিদ্যুল্লতিকার ন্যায় সোণার গিরিবালা

গৃহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইল। বাঙ্গালীর পবিত্র ও সরল মেয়ের স্বাধীনতা অতি শৈশবেই অপহৃত হইল।

বিজয়গোবিন্দ কলিকাতায় রহিয়াছেন, তিনি এ সকল কিছুই জানেন না। বিজয় যদি বাড়ী থাকিতেন, তবে কখনও প্রাণের যাতনা গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেন না। এখন যে তিনি এ সকল চিত্র হইতে দূরে রহিয়াছেন, সেখানেও তাঁহার মনের ভাব গোপন থাকিতেছে না। বিজয় দিন দিন মলিন ও জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িতেছেন। এক এক রাত্রিতে যেন এক এক সের রক্ত বিজয়ের শরীরে শুষ্ক হইয়া যায়। বিজয়ের বন্ধু বান্ধব বিজয়ের অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। বিজয়কে যাহারা বিশেষ রূপে জানিত, তাহারা বুঝিল, বিজয়ের পিতা, মাতার বিয়োগেও বিজয় এত কাতর হইবার ছেলে নহেন। বিজয় যদি পুরুষ না হইতেন, তবে বিজয়কে আজ প্রকৃত স্বামী-হারা সতী বলিয়া বোধ হইত। বস্তুত, ভাই ভগ্নী চিরকাল প্রাণে প্রাণে বাঁধা। উভয় সুখে দুখে এক-প্রাণ, এক-হৃদয়। মিলনের এমন সুন্দর শোভা আর কোথাও মিলে না। ভাই ভগ্নীর জীবন এক প্রণালী হইতে বহমান হইয়া যদি এক প্রাণের ন্যায় না হয়, তবে এ জগতে অভিন্ন হৃদয়ের অস্তিত্ব থাকিতে পারে কি না, গভীর সন্দেহ।

ক্রমে ক্রমে বিজয়ের মনের কথা সকলে জানিল। তখন সকলেই বিজয়কে শান্তনা বাক্য দ্বারা বুঝাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যত দিন ভগ্নীর জীবন হইতে এই দারুণ শেল উঠিয়া না যায়, তত দিন বিজয় শান্তনা পাইবার নহেন। ভগ্নী গিরিবালার বর্ত্তমান অবস্থা বিজয়ের মানসিক পরিবর্ত্তনের এক প্রধান কারণ হইয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারের প্রতিজ্ঞা।

আমরা তিনটী চিত্রকে পরে পরে চিত্রিত করিলাম। এখন পাঠক এবং লেখক উভয়েই সঙ্কটে পড়িতে হইতেছে। আমরা দেখিতেছি, পাঠকগণ অপেক্ষাও আমরা মহা সঙ্কটে পড়িয়াছি;—আমরা এখন কোন্ কথা অগ্রে বলিব? পাঠকগণ হয়ত মনে করিতেছেন, লেখক কি অপ-

রিণামদর্শী, পূর্ব্বে কেন সতর্ক হইল না? ঠিক এক সময়ের তিনটী ঘটনা, আমরা কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী অগ্রে চিত্র করিব, পূর্ব্বেও বুঝিতে পারি নাই, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। পাঠকগণের পথ পরিষ্কার, কারণ প্রত্যেকের রুচি অনুসারে কেহ হয়ত বলিবেন, কৃপানাথের কি হইল, অগ্রে বলিলেই ভাল হয়; কেহ বলিবেন, সোণার প্রতিমা গিরিবালার পরিণাম কি হইল? আর কেহ বা বিরক্ত হইয়া বলিবেন, অসহায় যুবকদ্বয়কে নদী তীরে ফেলিয়া এ সকল রঙ্গ কেন? পাঠকগণের স্বীয় স্বীয় রুচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলিতে পারেন, কিন্তু আমরা সে রূপ পারি না; আমরা প্রত্যেকের মন রাখিয়া চলিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমরা জানি, এক জনের মন সন্তুষ্ট করিলে আমরা দুই জনের মন হারাই; এই অবস্থায় আমরা কোন্ দিকে যাইব, এ অতি কঠিন সমস্যা। কি প্রকারে আমরা এ সম্বন্ধে পূরণ করিতে সমর্থ হইব, বুঝিতে পারিতেছি না।

আমরা এখন উত্তম রূপে বুঝিতে পারিতেছি, উপন্যাস-লেখকগণের চিরপ্রতিজ্ঞা—প্রত্যেকের মন রাখিয়া চলা—আমরা রক্ষা করিতে পারিতেছি না। আধুনিক উপন্যাস-লেখকগণ মানব হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যেখানে দেখেন, সকলেরই মিলনের স্থান রহিয়াছে, সেই স্থান ধরিয়া প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হন। তজ্জন্যই আমরা দেখিতে পাই, "উপন্যাস" এই কথা শুনিলেই পাঠকের মনে উদিত হয়,—ইহাতে প্রণয়ের মিষ্ট কথা আছে,—যাহাতে মানবের মন মোমের পুতুলের ন্যায় গলিয়া যায়, যাহাতে অঙ্গ অবশ হইয়া উঠে, সেই মধু-মাখা প্রণয়গীতি আছে। উপন্যাসের-পাঠকশ্রেণীর রুচি দিন দিন মলিন ও কলঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে।

উপন্যাস-লেখকগণের নিকট আর একটী পথ পরিষ্কার। মানবের রুচি যে দিকে ধাবিত, সেই দিকে অগ্রসর হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। কিন্তু আমরা প্রায়ই এই দুইটী পথ লক্ষ্য করিতে পারি না। প্রেম মানবের একটী উৎকৃষ্ট ভূষণ, ইহার মমতা আমরা একেবারে পরিত্যাগ করিতে না পারিলেও, আমরা মানব মনের দুর্গতির সহিত গড়াইয়া পড়িতে শিখি নাই। মানব-হৃদয়ের যে ভূষণ গুলি সাধন-সাপেক্ষ, এবং যে গুলি না থাকিলে মানবে আর পশুতে কোন বৈষম্য লক্ষিত হইত না, আমরা মানবের সেই

ভূষণগুলিকে সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়ের সহিত ভালবাসি। কিন্তু প্রণয়-পীযূষ-পরিপূরিত, নীতি-বিৰ্জ্জিত স্রোতে বহমান সহস্র সহস্র যুবকের মন বর্ত্তমানে যে দিকে ধাবিত, আমরা সে দিকে কটাক্ষপাত করিতেও ভীত, স্তম্ভিত এবং অবসন্ন হই। যে দেশের অধিকাংশের লক্ষ্য কেবল ক্ষণস্থায়ী ভোগ বিলাসের প্রতি, যে দেশের অধিকাংশ লোক কেবল উত্তেজিত রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া সমাজ এবং ধর্ম্মের কঠিন শৃঙ্খল ছেদন করিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না, সে দেশের বহমান স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, সে দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিতেও আমাদের হৃদয় আতঙ্কে কম্পিত হয়। আবার অন্যদিকে যে দেশের শিক্ষিতশ্রেণী কেবল যশ মানের জন্যই কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকে, স্বার্থের কথা ভিন্ন যে দেশে অন্য বিষয়ে চিন্তা করিতেও লোক ভীত হয়,সে দেশের প্রচলিত মতের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, আমরা সে দেশের কাহিনী দুর্ব্বল স্মৃতিতে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেও সঙ্কুচিত হই। তাই আমরা বলিতেছিলাম, আমরা ইচ্ছা করিয়া অতি কঠিন সমস্যা পূরণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি। বর্ত্তমান কাহিনীতে আমরা যে কি চিত্র করিব, সে বিষয়ে আমরা কিছুই প্রতিজ্ঞা করিতে পারিতেছি না; তবে দেশের প্রচলিত কতকগুলি আচার ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিতে চেষ্টা করিব, তাহা এক প্রকার নিশ্চয়। আমরা যে আমি গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমরাও বুঝিতে পারিতেছি। আমাদের অপেক্ষা কোন চিন্তাশীল, বহুদর্শী, এবং প্রতিভাশালী লোক যদি এই ভার গ্রহণ করিতেন, আমাদের সুখের সীমা থাকিত না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় হিতৈষীগণের আচরণে আমরা হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছি, এবং এ বিষয়ে আমরা যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা প্রচার করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া এবং এই কার্য্যে আর কেহই মনোযোগ দিতেছেন না বলিয়া আমরা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। আমাদের শিক্ষা, জ্ঞান, এবং প্রতিভায় আমরা এ প্রকার কাহিনীতে বিশেষ রূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিব, আমাদের সে অহঙ্কার নাই। তবে ভরসা এই, এ বিষয়ে যখন আর কোন প্রকার গ্রন্থ নাই, তখন হৃদয়মান পাঠকগণ ইহাকেই আদর করিতে পারেন। ইহা ভাবিয়াই আমরা এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমরা পাঠকগণের সকলের মন রক্ষা করিতে পারিব, আমাদের সে আশা নাই। বরং এবার আমরা অনেকের তির-

স্কার, গালাগালি পুরস্কার পাইব, এ আশা আমাদের মনে জাগিতেছে। এই কঠিন ব্রত পালন করিবার সময়ে আমরা অনেক বন্ধুর মন হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইব, অনেকের ভালবাসার মায়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব, তাহা আমরা বেশ বুঝিতেছি। কি করিব? ব্রুটস বহু শতাব্দী পূর্ব্বে কর্ত্তব্যের অনুরোধে অভিন্ন বন্ধুর বক্ষে আঘাত করিতে পারিয়াছিলেন। ম্যাট্‌সিনি দেশের জন্য পরম আরাধ্য পিতা মাতার হৃদয়েও দারুণ আঘাত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা সেই মহাত্মাদিগের পদ-রেণু বহনে সমর্থ নই, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে বন্ধুবান্ধবের মুখশ্রী ভুলিতে পারিব না কেন, জানি না। ঈশ্বর যদি আমাদের জীবনের লক্ষ্য থাকেন, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি যদি আমাদিগকে দেশের উন্নতি-সাধনের জন্য অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে,এবং বিবেক ও ঈশ্বরের আদেশ যদি আমাদিগকে সৎপথে লইয়া যাইতে থাকে,তবে আমরা আর কিছু পারি বা না পারি,বন্ধুবান্ধবের ভালবাসা ভুলিয়া সত্য ঘোষণা করিতে পারিব, আশা আছে। তবে ইহা নিশ্চয় যে, আমরা পাঠকগণের মন রাখিয়া চলিতে পারিব না। এস্থলে একথা না বলিলে কপটতা প্রকাশ করা হয় যে, আমরা আমাদের আপন প্রণালী অনুসারে অগ্রসর হইব। এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়াও যদি কোন সহৃদয় পাঠক অনুগ্রহ করিয়া ধৈর্য্য ধরিতে সক্ষম হন, তবে তাঁহাদিগকেই কেবল আমরা হৃদয়ের সহিত এই হতাস হৃদয়ের প্রলাপ শ্রবণ করিতে অনুরোধ করি। যদি এই প্রকার কোন সহৃদয় ধৈর্য্যশীল পাঠক থাকেন, তবে তাঁকে ডাকিতেছি, দেশের বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশ করুণ। এদেশের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি অন্তরে আঘাত পাইয়া থাকেন, তবে তাহাকেও আমরা আহ্বান করি, কারণ এ কাহিনী পাঠে সমদুঃখী ব্যক্তির হৃদয়ে একটু সান্ত্বনা লাভ হইতে পারে। আমরা সরল ভাবে, সরল অন্তরে কতক পাঠককে বিদায় লইতে অনুরোধ করিয়া এবং আর কতককে আহ্বান করিয়া আমাদের কাহিনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কৃষক ও কৃষকের বাড়ী।

যে কৃষক আমাদের অসহায় যুবকদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, আষাঢ় মাসের বৃষ্টি মস্তকে করিয়া দিবা দুপ্রহরের সময়, অতি দূরে বৈদ্য আনিতে গিয়াছিল, তাহার নাম ঈশান মণ্ডল। ঈশান মণ্ডলের বয়স ৩০বৎসরের অধিক হইবে না। ঈশানের পরিবারের মধ্যে স্ত্রী, একটী পালিতা কন্যা, এবং একটী মাত্র পুত্র। আর পরিবারের মধ্যে গুটিকতক গরু, দুখানি ঘর,এবং আর কয়েকটী কলা গাছ। গৃহসামগ্রীর মধ্যে কয়েকখানি থাল, দুটী ঘটী, কয়েকখানি মৃৎপাত্র, এবং জলপানের জন্য কয়েকটী নারিকেলের মালা। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে জমিদারদিগের অত্যাচারে কৃষকের ভিটার মাটি পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইত। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত শস্য না হওয়ায় এবং জমিদারের অত্যাচারে ঈশান ভয়ানক কষ্টের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গৃহে যে কিছু দ্রব্যাদি ছিল, তা সকলি প্রায় একে একে বিক্রয় করিয়া জমিদারের উদর পূরণ করিয়াছে। ঈশানের বাড়ীর অবস্থা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মনে সন্দেহ হয় যে, এত দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিয়াও কি লোক জীবিত থাকিতে পারে? ঈশানের আর কিছুই সম্বল নাই, কিন্তু হৃদয়ের যে একটু দয়া এবং পরোপকারে যে একটু প্রবৃত্তি ছিল, তাহাই আজ পর্য্যন্ত ঈশানকে জীবিত রাখিয়াছে; নচেৎ এতদিন ঈশান ও তার পরিবার মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িত।

ঈশান বাড়ী পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই স্ত্রীকে বলিয়া গিয়াছিল যে, বাবুদিগকে বিশেষ যত্ন করিও। আমাদের যুবক যখন রোগীকে কৃষকের বাড়ীতে তুলিয়া আনিলেন, সেই সময় হইতেই কৃষক-পত্নীর একান্ত যত্ন দেখিতে পাইলেন। কৃষক-পত্নী আপন দ্রব্যাদির অপ্রতুল জানিয়া এবাড়ী ওবাড়ী হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আহারের সামগ্রী,—ভাল তণ্ডুল, ঘৃত, দুগ্ধ, ডাইল প্রভৃতি সংগ্রহ করিল। যুবক কৃষক-পত্নীকে সেবা শুশ্রূষার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিয়া বলিলেন,—আমাদের নৌকায় সকলি আছে, তোমার সে জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না।

সমস্ত দিন পর সন্ধ্যার সময় রোগীর অবস্থা একটু ভাল বোধ হইতেছে; যুবক রোগীর পার্শ্বে বসিয়া আবশ্যকমত সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল, তখন নৌকা হইতে এক জন মাঝী আসিয়া রোগীর পার্শ্বে বসিলে যুবক আহার করিতে নৌকায় গমন করিলেন।

রাত্রি ক্রমেই গভীর ও নিস্তব্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। অল্পক্ষণ হইল বৃষ্টি থামিয়াছে, কিন্তু এখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই,—আকাশভরা মেঘ, কত ব্যস্ততার সহিত দ্রুত চলিতেছে, ছুটিতেছে। দুই একটী নক্ষত্র একবার দেখা দিতে না দিতে আবার মেঘের ক্রোড়ে লুক্কায়িত হইতেছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যুবকের আহার-কার্য্য সমাধা হইল; তিনি আহারান্তে ছইয়ের উপরে বসিয়া ক্ষণকাল চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। দুটী চিত্র তাঁহার মনের মধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে;—এই দুটী মধুর ছবির কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি ক্রমে যেন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; এই সময়ে "আপনি উপরে আসুন" এই কথাটী অতি মৃদু ভাবে তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন—কৃষকের পালিতা কন্যা। কৃষক-পালিতা কন্যার মলিন বেশ, কারণ অবস্থায় তাঁহাকে মলিন করিয়াছে;—কিন্তু মন অত্যন্ত শান্ত ও বিনয়ী। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে আমাদের যুবক এপ্রকার শান্ত এবং ধীর প্রকৃতির মেয়ে আজ পর্য্যন্ত আর দেখেন নাই। এই কন্যাটীর বিষয়ই তিনি পূর্ব্বে ভাবিতেছিলেন; তৎসঙ্গে আর একটী সমদুঃখী মলিন যুবকের কথা মনে জাগিতেছিল। ডাকের পর সে চিত্র ভুলিয়া যুবক নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিলেন। কৃষক কন্যা অগ্রে এবং তিনি পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন।

যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন;—আমাকে ডাক্‌তে এসেছ কি জন্য?

কৃষক-কন্যা বলিলেন,—রোগী আপনাকে ডাক্‌ছেন।

যুবক।—তিনি কি চোক্ মেলেছেন?

কৃষক-কন্যা—হাঁ, এই কতক্ষণ হ'ল তিনি চোক্ মেলেছেন, তিনি দুই একটী কথাও বল্‌ছেন।

এই সময়ে সহসা যেন চতুর্দ্দিকে লোক আগমনের শব্দ হইল, "এদিকে এদিকে" এই শব্দ নৈশাকাশ ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইল।

যুবক অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, তিনি ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন

না, কিন্তু কৃষক-কন্যা অত্যন্ত সশঙ্কিতা হইয়া যুবকের পার্শ্বে আশ্রয় লইয়া বলিলেন,—"আপনি আমাকে রক্ষা করতে প্রস্তুত হউন, পিতা বাড়ীতে নাই, না জানি আজ কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে।"

যুবক একথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন না,—বলিলেন, তুমি কি বিপদের আশঙ্কা কর্‌ছেছ?

কৃষক-কন্যা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"জমিদার—জমিদারের অত্যাচার—অবিচার। প্রস্তুত হউন, দেখুন ঐ আসিল।"

যুবক বলিলেন,—ভয় কি—উপরে ঈশ্বর, নিম্নে রাজা,—ভয় কি তোমার?

কৃষক কন্যা।—আপনি সাবধান হউন,—এদেশে রাজা নাই,—এদেশে জমিদারই সর্ব্বে সর্ব্বা; সেদিন আমাদের গ্রামের পূর্ব্বধারের গ্রাম হইতে একজন জমিদার একটী ব্রাহ্মণের মেয়েকে জোর করে বিবাহ করেছে,—সে গোল আজও মেটে নাই; আপনি এ সকল পাড়াগাঁয়ের অবস্থা কিছুই জানেন না প্রস্তুত হউন। পুলিস জমিদারের টাকার বশ।

এই কথা বলা হইতে না হইতে লাঠিয়াল-শ্রেণী কৃষক কন্যা এবং যুবককে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই অসহায় যুবক এবং যুবতী লাঠিয়াল-শ্রেণীর দ্বারা বেষ্টিত হইল যে, যুবক কি কর্ত্তব্য, ইহাও ঠিক করিতে সময় পাইলেন না। সম্মুখে একটী ভদ্রবেশধারী লোক, লাঠিয়াল-শ্রেণীকে দাঁড়াইতে বলিয়া যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"আপন মান লাএই প্রায়ন কর, নচেৎ আগে তোর প্রাণ লইতে আদেশ কর্‌ব।"

বাবু ঁ কৃষক-কন্যাকে আপনার পশ্চাতে রাখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—কি ীবনেশ্চ তোমরা এত রাত্রে এখানে আসিয়াছ, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি যদি এই দলের অধিনায়ক হও, তবে আমি বলি, অদ্য তোমরা পলায়ন কর; ঠিক জানিও, আমি থাক্‌তে কখনও তোমাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না।

এই কথা শুনিয়া উত্তেজিত জমিদার-যুবক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—তুই কেরে? এখনই তোর মস্তক ধূলিতে লুণ্ঠিত করব। এই বলিয়াই জমিদার-পুত্র যুবকের মস্তকে এক লাঠির আঘাত করিল। সে আঘাতে যুবকের মস্তকের চর্ম্ম ভেদ করিয়া শোণিত নির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু যুবক তাহাতে কাতর না হইয়া দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া জমিদার-যুবকের

নাসিকার উপরে সজোরে একটী বিষম আঘাত করিলেন। সে আঘাতে জমিদার-পুত্র চিৎকার করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। জমিদারের লাঠিয়াল শ্রেণী একত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ যুবককে আক্রমণ করিল। এদিকে যুবকের ইঙ্গিতে পশ্চাৎ দিক হইতে কৃষক-কন্যা যুবকের নৌকায় পলায়ন করিলেন।

যুবক নিতান্ত অসহায় ভাবিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু গ্রামের কেহই সাহায্যার্থ আগমন করিল না। ইত্যবসরে জমিদার-পুত্র একটু স্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ক্রোধ-কম্পিত-স্বরে আদেশ করিলেন,—ঈশানের বাড়ী লুঠ করিতে চল্, দেখি আজ কে আমাকে বাধা দেয়।

এই সময়ে যুবক একবার চক্ষুর নিমিষে দেখিলেন যে, প্রায় ২০০ লাঠিয়াল একত্রিত হইয়াছে। ইহাদিগকে বাধা দেওয়া নিতান্ত অবিবেচকের কার্য্য ভাবিয়া, যখন লাঠিয়ালের দল জমিদার-পুত্রের আদেশে ঈশানের বাড়ী লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইল, তখন তিনি ফিরিয়া নৌকায় উঠিলেন; এবং কৃষক-কন্যাকে লইয়া নৌকা খুলিয়া নদীর অপর পারে যাইয়া পুলিশ ষ্টেসনের তত্ত্ব লইলেন। বলা বাহুল্য যে, সেই সময়েই তাহারা পুলিশে সংবাদ দিতে চলিলেন। এদিকে আমাদিগের রোগী এবং এক জন মাঝী কৃষকের বাড়ীতে রহিলেন।

জমিদার-পুত্র ক্রোধে অধীর হইয়া ঈশানের বাড়ীতে যাইয়া মার মার করিয়া পড়িল। আমাদের মাঝী বিপদের আশঙ্কা করিয়া রোগীকে কোলে তুলিয়া অন্য এক কৃষকের বাড়ীতে লইয়া চলিল। এদি[illegible] পল্লী[illegible] স্ত্রী আপন সন্তান কয়টীকে একত্র করিয়া পশ্চাৎ দ্বার দিয়া [illegible] যুবক[illegible] [illegible]। জমিদার-পুত্র বিনা বাধায় ঈশানের ঘর বাড়ী সমস্ত ভূমি[illegible] তবে ফিরিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভাবী পথ।

ঘটনা মনুষ্য-জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া লোককে উন্নতির পথে লইয়া যায়। প্রভূত ক্ষমতা-সম্পন্ন রিয়েঞ্জি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইটালীতে স্বাধীনতার যে তরঙ্গ তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, উপন্যাস-লেখকের

কথা যদি সত্য হয়, তবে সে তরঙ্গ তুলিবার ক্ষমতা রিয়েঞ্জি অতি শৈশবে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু-ঘটনা হইতে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। রিয়েঞ্জির সময়ে ইটালীর কি প্রকার দুর্দ্দশার সময়, তাহা ইতিহাস-পাঠক জ্ঞাত আছেন। আমরা যখন তদানীন্তনের ইটালীর দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করি, তখন আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই সময় কলোনা এবং আরসিনি নামক দুই সম্প্রদায়ের অত্যাচারে বিদেশের পদানত ইটালী যায় যায় হইতেছিল। ব্যভিচার, দস্যুবৃত্তি করিয়া ইহারা দুর্ব্বলদিগকে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত রাখিত। এই সময়ে ইটালীর উদ্ধারকর্ত্তা রিয়েঞ্জি জন্ম গ্রহণ করেন। যখন তাহার বয়স বিংশ বৎসর অতিক্রম করে নাই, তখন তিনি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এক স্থানে রাখিয়া স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, দস্যুর অস্ত্রাঘাতে তাহার ভ্রাতা মৃত্যু-শয্যায় শয়ান, শরীর রক্তে প্লাবিত। এই অবৈধ, অন্যায় এবং আইন-বিরুদ্ধ কার্য্যে তাহার হৃদয়ে যে শোকাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, যদি তাহা কালের সহিত নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত, ইটালী তবে আজ রিয়েঞ্জির নামে গৌরবান্বিত হইত কি না, সন্দেহের বিষয়। বর্ত্তমান নব্যবঙ্গের অধিনায়ক বলিয়া যিনি আপনার গৌরবে আপনি মত্ত হইয়া উঠিতেছেন; আজ যাঁহার হৃদয় স্বদেশের জন্য ব্যাকুল, স্বদেশের উন্নতির কামনায় যাঁহার মস্তিষ্ক বিলোড়িত; ঘটনার পরাক্রম মানবকে জয় করিতে সক্ষম না হইলে, আজ তাঁহাকে সাহেব-বেশধারী গবর্ণমেন্টের একজন সামান্য কর্ম্মচারী বলিয়া এদেশের সকলে জানিত। এই প্রকার ঘটনা-বিঘ্ন মানবের পক্ষে পরম মঙ্গলের সোপান। কৃপানাথ বাবু ইডেন উদ্যানের নিকটে যে প্রকার অপমানিত হইলেন, তাহার জীবনের ভাবী উন্নতির উহাই সহায় হইল। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাটী কৃপানাথ বাবুর জীবনে কি পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করিবার পূর্ব্বে আমরা কৃপানাথ বাবুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদান করিব। কৃপানাথ বাবুর বাড়ী যশহরে, গ্রামের নাম আমাদের স্মরণ নাই এবং উপন্যাসের সহিত সে গ্রামের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। কৃপানাথ বাবুর তিন সহোদর, পৈতৃক বিষয় কিছু আছে। অনেক দিন হইল, কৃপানাথ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচিত হইয়াছেন, কলিকাতায় তিনি যে বৎসর যে পরীক্ষা দিয়াছেন, তাহাতেই প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় হইয়াছেন। ইনি ২০ বৎসরের সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং পর বৎসর

গল্‌ট ক্রাইষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যয়নার্থ বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতেও সুখ্যাতির সহিত অনেকগুলি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে আসিয়াছেন। কৃপানাথ বাবু বাল্যকাল হইতে সরল, বিনয়ী, ধর্ম্মপিপাসু ও অমায়িক বলিয়া পরিচিত। অধ্যয়নের তৃষ্ণা তাঁহাকে সর্ব্বদাই আড়ম্বর-শূন্য করিয়া রাখিত। বিলাতে যাইবার সময় তাঁহার বন্ধু বান্ধব বারম্বার বলিয়া দিয়াছিলেন, "যাও ভাই, পরিবর্ত্তনের স্রোতের মধ্যে, দেখ যেন স্বদেশী ধূতি চাদর খানিকে ভুলে এস না।" এবং তিনিও বাল্যকাল হইতে এ সকল বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। বাল্যকাল হইতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার মনে দৃঢ় সংকল্প ছিল, কখনও স্বদেশের বেশ পরিবর্ত্তন করিবেন না ; এবং দেশের যাহা ভাল, তাহা সাধ্যানুসারে রক্ষা করিয়া চলিবেন। বিলাতে যাত্রা করিবার সময় তাহার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইতেছিল, স্বদেশ, পরিবার, স্বদেশীয় বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, ইহাতে তাঁহার যত না কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু পরিবর্ত্তনের স্রোতের মধ্যে অঙ্গ ঢালিতে যাইতেছেন ; ইহা প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অন্তরে দারুণ আঘাত করিতেছিল। এই প্রকার চিন্তা মনে লইয়া তিনি বিলাতে গমন করেন; এদেশের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি ধূতি চাদর পরিধান করিয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, এই সংবাদটী সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলেই কৃপানাথকে শত শত বার ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিল। কৃপানাথ বাবুর হৃদয়ের সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে ,—দুর্ব্বল মনে নৈতিক তেজের আধিপত্য পূর্ব্বাপেক্ষা আরো স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার মনে অধ্যয়নের তৃষ্ণা আরো প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে ; পূর্ব্বের অবস্থা তিনি কিছুই ভুলিয়া যান নাই। বন্ধু বান্ধবের সহিত তিনি বিলাত হইতে আসিয়াও একাসনে বসিয়াই ভোজন করেন এবং ছাত্রদিগের বাসাতেই থাকেন। তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে দুই একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিও ছিলেন,তাঁহারা তাঁহাকে আপনাদের বাড়ীতে রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি দরিদ্র বেশে, দরিদ্র স্কুলের ছাত্রদিগের বাসাতেই থাকেন। তিনি কি কার্য্য গ্রহণ করিবেন,তাহা আজ পর্য্যন্তও ঠিক হয় নাই। বারিষ্টারি করিতে তাহার অভিমত নাই,কুসংস্কারই হউক বা সুসংস্কারই হউক, বাল্য কাল হইতে তাঁহার মনে ধারণা ছিল, উকিল এবং বারিষ্টার হইলে সৎপথে থাকা যায় না। এই সংস্কারের আধিপত্য অদ্যাবধিও

সমান ভাবে রহিয়াছে, তাঁহার বারিষ্টারি করিতে ইচ্ছা নাই; তাঁহার ইচ্ছা, কোন কলেজের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। আজ কাল অনেকানেক বড় লোক তাঁহাকে বারিষ্টারি করিতে পরামর্শ দিতেছেন, অনেকে বলেন,—এ পোষাক পরিত্যাগ কর, সংসারে মান সম্ভ্রম চাই, ধন চাই, যশ চাই, এ সকল বেশ পরিত্যাগ কর। কৃপানাথ বাবু এ সকল পরামর্শদাতাগণকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন, তজ্জন্য স্পষ্ট কথায় উত্তর দিতে চাহেন না, কিন্তু মনে মনে ভাবেন,—'যশ,মান,ধন চাই বলিয়া যদি দেশের মমতা পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে এসকল কিছুই চাই না।' এই প্রকার ভাবে এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু অদ্যাবধিও তাঁহার ভাবী পথ পরিষ্কার হয় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেশে বিষয় কর্ম্ম লইয়া আছেন, তিনি কৃপানাথ বাবুকে আবার হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিবার চেষ্টায় আছেন। ছোট ভাই এবার গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছেন, তিনি এবার বিলাতে যাত্রা করিবেন। পাঠক প্রথম পরিচ্ছেদে যে দুইটী যুবককে দেখিয়াছেন; তাহার মধ্যে যেটী রোগী, সেইটীই কৃপানাথ বাবুর ভ্রাতা, নাম ব্রজনাথ ঘোষ। তাঁহার সহিত যে যুবকটী রহিয়াছেন, তাহার নাম বেহারিলাল রায়; ইহারা উভয়ে মিলিত হইয়া বেহারী লালের বাড়ী হইতে কৃপানাথবাবুদের বাড়ী যাইতেছিলেন। যে সময়ে কৃপানাথ বাবু ইডেন উদ্যানের পার্শ্বে অপমানিত হইলেন, সে সময়ে এই দুটী যুবক নদী তীরে ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছেন; তাহা পাঠকগণ দেখিয়াছেন। কৃপানাথ বাবু অনিচ্ছা সত্বেও ইংরাজ মহিলার গাড়িতে উঠিয়া তাহার বাড়ীতে গেলেন; সেখানে উক্ত মহিলা কৃপানাথবাবুকে কি প্রকার ভাবে প্রবোধ দিলেন, তাহাই এক্ষণ বিবৃত হইবে। বলা বহুল্য যে, উক্ত মহিলা কৃপানাথ বাবুকে বিশেষ রূপ জানিতেন।

কৃপানাথ বাবুকে ইংরাজ মহিলা উপযুক্ত সম্মান সহকারে আপন গৃহে গ্রহণ করিলেন। কৃপানাথ বাবুর মনে যে সকল অপমানের কথা দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্য মহিলা যথেষ্ট যত্ন পাইলেন। কৃপানাথ বাবুর সহিত হিন্দু-জীবন এবং ইংরাজ-জীবনের অনেক প্রকার আলোচনা হইল। অবশেষে মহিলা বলিলেন,—"হিন্দু সমাজের আমুল সংস্কার চাই, কেবল যে বেশ এবং আহারের পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছি, তাহা নহে, সামাজিক রীতি নীতিও পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত। আমি ভরসা করি, অদ্যকার ব্যবহার আপনার জীবনের অনেক উন্নতি সাধন করিবে। আপনি

আর বিলম্ব না করিয়া বেশ ভূষা পরিবর্ত্তন করুন, তারপর আপনার স্ত্রীকে আনয়ন করুন, এবং সাহেব মহলে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া বারিষ্টারি করিতে আরম্ভ করুন। আপনি বলিতেছিলেন, আমি একা এ সকল করিলে কি হইবে? তা সত্য বটে, কিন্তু যাহা ভাল, তাহা একাকী বলিয়া উপেক্ষা করা কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের পক্ষে উচিত নহে। আপনি এ পথে অগ্রসর হইলে, আপনাকে অনুসরণ করিয়া সমস্ত দেশ এ পথে ফিরিবে।"

এ সকল কথা কৃপানাথ বাবু অতি গম্ভীর ভাবে বসিয়া শ্রবণ করিলেন। হিন্দু সমাজের আমূল সংস্কার প্রয়োজন, একথা তাঁহার মন বুঝিতেছে না,— দেশের সমাজ ছাড়িয়া একাকী এক পথে হাটিলে সকল দেশ তাঁহার পথ অনুসরণ করিবে, এ কথাও তাঁহার মন বুঝিতেছে না। কিন্তু তত্রাচ তাঁহার মন যেন কিছু নত হইয়া আসিতেছে। তিনি বুঝিলেন না, কিন্তু অজ্ঞাতসারে তাহার মনের মধ্যে একটু পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা দেখা দিল। এই ইচ্ছার ফল কি হইল, তাহা কিছু দিন পরেই সকলে দেখিতে পাইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

টাকার চক্রান্ত।

যে রজনীতে কৃষকের বাড়ী লুণ্ঠিত হইয়াছিল, সময়ে সে রাত্রি পোহাইল। জমিদারের কর্ম্মচারীগণ অতি প্রত্যুষে চারিদিকে বাহির হইয়া পড়িল; চারিজন সর্দ্দার ঈশানকে গ্রেপ্তার করিতে ধাবিত হইল। থানার দিকে দুজন গোমস্তা প্রেরিত হইল। বেহারিলাল রায় মূর্খ, নচেৎ সে কখনও পুলিসে সংবাদ দিতে যাইত না। সে যদি মফঃস্বলের জমিদারের পরাক্রম ও একাধিপত্যের বিষয় কিছু জানিত, তবে কখনও এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না। পরদিন যাহা যাহা ঘটিল, তাহা আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

ঈশান কবিরাজ লইয়া বাড়ী আসিতেছিল, পথিমধ্যে জমিদারে. লোকেরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। পেয়াদারা বলিল—"পুণ্যাহ কিস্তি খাজানা আর বাকী থাকিবে না, হয় খাজানা চুকাইয়া দেও, না হয় অদ্য তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইব।" এই কথা শুনিয়া ক

দিকশূন্য ঈশান চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিল; এই সকল ব্যাপারের মূল কি, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। ঘরে ছেলে মেয়ের আহারের কিছুই নাই; অদ্য ঘটী বাটী বন্ধক দিয়া কর্জ্জ না পাইলে আর রক্ষা নাই, এ সকল ঈশান জানিত। ঈশানের অবস্থা এত শোচনীয় যে, রোজ আনে রোজ খায়। গত বৎসর যে কিছু শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা জমিদারের খাজানা ও সুদ দিতে, নায়েব গোমস্তার নজরানা, জমিদারের দর্শনি প্রভৃতি-তেই প্রায় শেষ হইয়াছিল, অবশিষ্ট যাহা ছিল, তাহা মহাজন আদায় করিয়া লইয়াছে। বাঙ্গালার অধিকাংশ কৃষকের দুরবস্থা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কৃষকেরা কি প্রকার দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া দিন কাটায়। বিগত পৌষ মাষ পর্য্যন্ত ঈশান তিন শালি মাত্র ধান কর্জ্জ করে, চৈত্র মাসে সেই ধানের সুদ সমেত ৫ শালি ধান মহাজন আদায় করিয়া লইয়াছে। অবশিষ্ট যা কিছু ছিল, তাতে চৈত্র মাস গিয়াছে; বৈশাখ মাস হইতে আবার কর্জ্জ আরম্ভ হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে পুণ্যাহের কিস্তিতে ঈশানকে ৮৲ টাকা দিতে হয়, কিন্তু যার গ্রাসাচ্ছাদনেই কষ্ট, সে কি প্রকারে খাজানা দিবে? ঈশান এবৎসর প্রথমেই বিপদ গণনা করিয়াছে; কিন্তু সৎপথে থাকিয়া কত দিন জীবিত থাকা যায়, এটী কেবল ঈশানের পরীক্ষার বাকী ছিল। এবার বোধ হয়, সে পরীক্ষার ফলও প্রকাশ পাইবে।

পরদুঃখকাতর এবং আপন অবস্থা-পীড়নে বিষণ্ণ ও ম্লান ঈশানকে যখন গ্রেপ্তার করিল, তখন ঈশান বলিল, ভাই আমাকে একবার ছেড়ে দেও, আমি বাড়ী যেয়ে খাবার যোগাড় ক'রে দিয়া তোমাদের সহিত যাইব।

সর্দ্দারেরা বলিল,—আজ আর আমাদের হাত নাই।

ঈশান নিতান্ত অনুপায় বুঝিয়া বলিল,—পৌষ মাসে ধান পাইলে তোমাদিগের প্রতি কিছু বিবেচনা কর্‌বো, ছেড়ে দাও।

সর্দ্দারেরা বলিল, তা আজ কোন মতেই পারি না, আজ খুবই বল বর যাহাই বল, কিছুতেই কিছু হবে না, এখন চল। ঈশান অগত্যা কবিরাজ মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া সর্দ্দারদিগের সহিত বন্দীভাবে চলিল। কবিরাজ দুঃখিত চিত্তে কৃষকের বাড়ী চলিলেন।

বেহারীলাল রায় এবং কৃষক-কন্যা রাত্রেই পুলিশে এজাহার দিয়াছিলেন। কিন্তু পুলিশ ভবানীকান্ত রায়ের একপ্রকার পোষ্য পুত্র; রজনীতে পুলিশ

কোন ক্রমেই আসিল না; পর দিন একথা ওকথা তুলিয়া বেহারীকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময়ে জমিদারের লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। জমিদারের লোকের সহিত যে পরশমণি ছিল, তাহা স্পর্শে পুলিশ আরো রূপান্তর ধারণ করিল; বেহারীকে বলিল, "তুমি যে অল্পবয়স্কা যুবতীকে বাহির করিয়া আনিয়াছ, তাহার অভিযোগ করিতে জমিদারের লোক আসিয়াছে; তুমি এখন অল্পে অল্পে পলায়ন কর; নচেৎ অত্যন্ত বিপদে পড়িবে।" বেহারী সকলি বুঝিতে পারিলেন। পুলিশ তাঁহার পক্ষ হইবে না, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না, কিন্তু এ প্রকার অত্যাচারের কি প্রতিশোধ নাই? দরিদ্র, অসহায় কৃষকদিগের কি বাঙ্গলায় মা বাপ নাই, ইহাদিগের জন্য কি ন্যায় বিচার নাই, এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে দুঃখে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বেহারীলাল থানার গৃহে বসিয়াছিলেন, কৃষককন্যা নৌকায় ছিল, বেহারী নানাপ্রকার প্রতারণা, অত্যাচার, ছলনা ও বঞ্চনার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন, এদিকে পুলিশের ইঙ্গিতে লোকেরা মেয়েটিকে ভয় দেখাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

জমিদারের সহিত বিবাদ করিয়া প্রজা বাস করিতে পারে না। একথা ঈশান বিলক্ষণ জানিত; এই জন্য ঈশান সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিত, প্রায় কখনও বিবাদ করিত না। কিন্তু জমিদারও এমনি নৃশংস যে, এমন নিরীহ প্রজার ভিটামাটি উচ্ছিন্ন করিতেও লালায়িত। ঈশানের সহিত এবার জমিদার ভবানীকান্ত রায় একটু ভদ্রভাবে ব্যবহার করিলেন। ভদ্র ভাবে ব্যবহার করিবার অনেকগুলি কারণ ছিল; প্রথমতঃ তিনি বিদেশীয় যুবক বেহারীলাল রায়ের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন; সে ক্রোধ ভয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। বেহারীকে জব্দ করা ভবানীকান্তের একটী প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু ঈশানকে হাতে আনিতে না পারিলে, কোন ক্রমেই তাহা সফল হইতে পারে না। ইহা ভাবিয়া তিনি ঈশানকে বশ করিতে চেষ্টিত হইলেন। তিনি ঈশানকে বলিলেন, তোমার বাড়ীতে কাল যে যুবকটী একটী রোগীকে লয়ে এসেছে, সে ভয়ানক দাঙ্গাবাজ লোক, কল্য রাত্রে তোমার বাড়ী লুটে চিন্তামণিকে বাহির করে পলায়ন করেছে। আমি তাহাকে ধরিবার জন্য লোক পাঠায়েছি; কি হয় বলিতে পারি না। তোমার অবস্থার বিষয় আমি বেশ জানি, তোমার এই আশু বিপদের সময় পুণ্যাহের খাজনা আমি মাপ করিলাম, আর আজ এই ১০৲ টাকা তোমাকে দিতেছি; ইহা লয়ে তুমি

নালিস কর্‌তে যাও। ঈশান এসকল কথার কিছুই অর্থ বুঝিতে পারিল না। সে যুবকটীর মুখে যে প্রকার অমায়িকতা দেখিয়াছিল, তাহাতে যুবকটীকে এখনও এ প্রকার বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে হইতেছেনা; কিন্তু জমিদারের এসকল কথা বলিবার কারণ কি, ইহা বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। ইত্যবসরে চিন্তামণিকে লইয়া লোক জন সকল আহ্লাদ প্রকাশ করিতে করিতে আসিল, কেহ বলিতে লাগিল ৫০০শত টাকা পুরস্কার চাই, কেহ বলিল ১০০০ টাকা। এই প্রকার আনন্দ-ধ্বনি করিতে করিতে লোকজন সকল উপস্থিত হইল। ভবানীকান্ত হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, উদ্ধার হয়েছে, চিন্তামণিকে এনেছ, অবশ্য পুরস্কার পাবে। তারপর ঈশানকে বলিলেন, ঈশান, আর ভয় নাই। তোমার চিন্তামণিকে নৃশংসের হাত হইতে উদ্ধার করেছি, এক্ষণ তুমি নিঃসন্দেহ চিত্তে নালিশ কর্‌তে যাও।

ঈশান চিন্তামণির মুখ পানে তাকাইয়া দেখিলেন, চিন্তামণির দুনয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতেছে। ঈশান মনে করিল, বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছে বলিয়া আহ্লাদে জল পড়িতেছে; কিন্তু চিন্তামণির চক্ষের জল যে ঘোরতর আশঙ্কার পরিচায়ক, তাহা ঈশান বুঝিল না। চিন্তামণির সে চিত্র দেখিলে, বোধ হয় মেঘাবৃত চন্দ্রমা যেন মেঘ হইতে মুক্ত হইয়াই রাহুগ্রাসিত হইবার আশঙ্কায় কাঁপিতেছে। চিন্তামণির মুর্ত্তি,এই বিষাদ-প্রতিমা আর কখনও ফুটিয়া ফুটিয়া হাসিবে কি না, তাহা কে বলিতে পারে? মুখ ঈশান চিন্তামণির হৃদয়ের ভাব, মুখের বিরক্তি-চিহ্ন, বিষাদের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া যুবকের নামে নালিশ রুজু করিতে চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ছায়া পথগামী।

বেহারীলাল যখন পুলিশের চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন, তখন আর বৃথা বিলম্ব না করিয়া তিনি কৃষকের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রজনাথ সে

দিবস একটু সুস্থ আছেন দেখিয়া এবং আরো কতকগুলি বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি সেই দিনই ব্রজনাথকে নৌকায় তুলিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন, এবং আপনি গোপনে একটী ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহারই অনুসরণে নিযুক্ত হইলেন।

সমস্ত দিবস বিশেষ অনুসন্ধানের পর যখন তিনি সকল বিষয় জ্ঞাত হইলেন, তখন তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তিনি অস্থির হইলেন। সন্ধ্যার পুর্ব্বে তিনি নদীতীরে একাকী বসিয়া গভীর চিন্তা-সাগরে ডুবিলেন।

বেহারী আজ নদী তীরে বসিয়া অনেক বিষয়চিন্তা করিলেন, তাহার জীবনের ঘটনা সকল এক এক করিয়া তাহার কল্পনার পথে উঠিয়া নিবিয়া যাইতে লাগিল। জীবনের সকল ঘটনাই মনে উঠিয়া যেন অনাদৃত রূপে বিদায় লইল, বেহারী কোন ঘটনাকেই একাগ্র চিত্তে স্মৃতিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে অভিলাষী হইলেন না; কিন্তু একটী ঘটনা স্মরণ হইবা মাত্র তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, তাহার সর্ব্বশরীর হইতে যেন সহসা জ্বলন্ত অগ্নি-কণা বাহির হইতে লাগিল। এই বিপদের সময় সে ঘটনাটী বিহারীকে যেন নব বলে, নব উৎসাহে ও নবজীবনে অনুপ্রাণিত করিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিন দিন তিন রাত্রি ক্রন্দন করিয়া সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন; চতুর্থ দিনে অসহায় অবস্থায় শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, তাহার নিকট পৃথিবী যেন কল্পনার ন্যায় বোধ হইতেছে, যাহা দেখা যাইতেছে, এবং যাহা না দেখা যাইতেছে, উভয়ই যেন কল্পনা বলিয়া বোধ হইতেছে; পশু পক্ষী, মানব, এ সকলই যেন ভোজের বাজীর ন্যায় বোধ হইতেছে। এই সময়ে তাহার নয়ন যেন ক্রমেই উর্দ্ধ দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। পৃথিবী অন্ধকারময় হইল, আকাশ অন্ধকারে ছাইল, নক্ষত্র মণ্ডল অন্ধকারে ডুবিল, নয়ন এ সকল অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইতেছে। সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে যেন বিদ্যুতের ন্যায় একটী ধ্বনি প্রধাবিত হইয়া আসিল; বেহারী শুনিলেন, তাহার পিতা যেন বলিলেন;—"অবোধ সন্তান, কেন শোকে অধীর হও, দুঃখীও বিপন্নের অশ্রু মুছাইতে ধাও, তোমার আপন অশ্রু চক্ষে শুকাইয়া যাইবে; এবং যে সংসারকে এক্ষণ কল্পনা বলিয়া বোধ করিতেছ, উহাতেই স্বর্গের শোভা দেখিবে। পরের জন্য জীবন উৎসর্গ কর।" এই ঘটনা ও এই কথা কয়েকটী

স্মরণ হইবামাত্র তিনি দাঁড়াইলেন, তাহার দুনয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল ; তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"পিতঃ! কোথায় তুমি! এ কঠিন ব্রত পালন কি আমার দ্বারা সম্ভবে? সংসারের কুটীল পথের দুর্গমে পড়িয়া আমি ভাসিয়া যাই, পিত, আমি যাই, তোমার বেহারী তোমার প্রদর্শিত পুণ্য-পথ অতিক্রম করিয়া যায়, এমন সময় কোথায় তুমি? বল নাই, আশা নাই, উৎসাহ নাই, ধৈর্য্য নাই, সম্বল নাই, আছে কেবল যশের বাসনা,অর্থের লালসা ; আর সুখের কামনা ; পিত! রক্ত মাংস-ধারী মানবের পক্ষে পরের জন্য জীবন সৎসর্গ করা, এ কি প্রকার কথা? তবে পিতা যাই, আমার দ্বারা তোমার আদেশ প্রতিপালিত হইল না! চিন্তামণিকে দস্যুর হস্তে পড়িতে দেখিলাম, কিন্তু আমা দ্বারা তাহার উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই ; আমি নিরাশ্রয়, অসহায়। যদি সংসারের কলুষিত বাসনা আমাকে এই সময়ে উত্তেজিত করিত, তবে বুঝি বা অসম্ভবও সম্ভব হইত ; কিন্তু পিত, সৎ ইচ্ছার ত সে উত্তেজনার শক্তি নাই। থাকিলে কি পৃথিবী বিপন্নের অশ্রুতে প্লাবিত হইত, দুঃখীর আর্ত্তনাদে কি গগন পরিপূর্ণ হইত? সৎ ইচ্ছার সে বল নাই, সৎ ইচ্ছা এ জগতে আর জীবিত নাই। তবে পিতা যাই সংসারে ডুবিয়া, তবে পিতা যাই সংসারের কলুষিত স্বার্থের হ্রদে ডুবিয়া। আমার জীবনের একটী ব্রতপালন,—একটী বিপন্ন উদ্ধার, একটী দুঃখীর দুঃখ দূর করা, তাহাও যদি না পারিলাম, তবে আর সৎ ইচ্ছার পথানুবর্ত্তী হইয়া থাকিব কেন?" বেহারী আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি ভূতলশায়ী হইলেন। সেই বাহ্যজ্ঞান-শূন্য অবস্থায় তাহার মাথার উপরে সমস্ত নক্ষত্র-জগৎ একবার ঘুরিয়া গেল ; রজনী তাহার জন্য অপেক্ষা করিল না। পর দিন প্রাতঃকালে যখন তাহার চেতনা হইল, তখন দেখিলেন, তিনি বন্দী হইয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

অদৃশ্য পথে।

তারপর যাহা ঘটিল, তাহা সংক্ষেপে বলিব। ডেপুটী মাজেষ্ট্রেট উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, কি জানি কেন, সত্বরই মকদ্দমাটীর মীমাংসা করিলেন। সে মীমাংসায় বেহারী এই অল্প বয়সে কারাবাসী হইলেন; চিন্তামণি জমিদারের হাত হইতে মুক্ত হইয়া ডেপুটী মাজেষ্ট্রেটের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। ঈশান একূল ওকূল দুকূল হারাইয়া বিষণ্ণ মনে বাড়ীতে আশ্রয় লইল। চোরের উপর বাটপাড়ি হইল।

চিন্তামণি ডেপুটী মাজেষ্ট্রেটের চক্রান্তে জমিদার ভবানীকান্ত রায়ের হাত ছাড়া হইল। ভবানীকান্ত মনে করিলেন, ঈশানের দোষেই এই রূপ ঘটিল। উপায়হীন দুঃখী প্রজা জমিদারের কঠোর ও নির্দ্দয় ব্যবহারে আত্ম-সমর্পণ করিল। এক মাস কি দুই মাসের মধ্যে তাহার জমি জমা সকল ভবানীকান্ত কাড়িয়া লইলেন। কেবল ইহা করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, দিন দিন কত প্রকার নূতন উপায় অবলম্বন করিয়া দুঃখী ঈশান ও তাঁহার শোকক্লান্ত পরিবারের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। অবশেষে এমন হইয়া উঠিল যে, ঈশান আর তিষ্টিতে না পারিয়া পরিবার লইয়া বাড়ী ঘর পরিত্যাগ করিল। অল্প সময়ের মধ্যে তাহার ভিটা মাটি উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

বেহারী যখন কারাবারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তখন অসহয়া চিন্তামনির মন কি প্রকার হইল, তাহা আমরা বর্ণনা করিতে পারি না। সে আর কিছু জানুক বা না জানুক, ইহা বেশ জানিত যে, বেহারীলাল তাহার জন্যই মেয়াদ খাটিতে চলিল। এ কষ্ট একটী রমণীর পক্ষে সামান্য নহে। তারপর আশ্রয়দাতা পিতা মাতা সকল হারাইয়া এক পাষণ্ড পামরের হাতে পড়িলাম, ইহা আরও ভাবনার কথা। মকদ্দমার পর তিন দিবস চিন্তামণি অনাহারে ধরাশয্যায় পড়িয়া রহিলেন। প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে ডেপুটী মাজেষ্ট্রেটের কত চর আসিয়া কত প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহাতে ভুলিবে কে? এক হাতে বিষপাত্র অপর হাতে সুধা

লইয়া সময়ে সময়ে ডেপুটী মাজেষ্ট্রেট আপনিও আসিয়া ভুলাইতে, প্রবোধ ও শান্তনা দিতে প্রবৃত্ত হইতেন, কিন্তু এক দিন, দুদিন, তিন দিনের মধ্যে চিন্তামণি একটু জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিল না। তিন দিবসের পর ডেপুটী মাজেষ্ট্রেটের মনে একটু আশঙ্কা হইতে লাগিল; তিনি চতুর্থ দিবসে বলিলেন;—"তুমি যদি বেহারী বাবুকে দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে তাহার সহিত দেখা করিতে দিতে পারি, কিম্বা যদি তোমার পিতা মাতার সহিত একত্র থাকিতে ইচ্ছা হয়, তবে তাহাদিগকে এখানে অনিয়া রাখিতে পারি।" এই দুইটী কথা শুনিয়া চিন্তামণি বলিল,—"যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আমাকে একবার বেহারী বাবুর সহিত দেখা করিতে দিন; বাবার সহিত এখন দেখা করিতে আমার ইচ্ছা নাই; আপনার আশ্রয়ে যখন আছি, তখন আপনাকেই আমি পিতার ন্যায় মনে করি। পিতার অভাব-কষ্ট নাই।"

ডেপুটী বাবু মনে মনে ভাবিলেন, সে সকল পরে বুঝা যাইবে, এখন তোমার মন সুস্থ করাই প্রধান কর্ত্তব্য; বলিলেন, তবে অদ্য বৈকালে তোমাকে জেলে পাঠাইয়া দিব, তুমি এখন কিছু আহার কর। চিন্তামণি বলিল;—বেহারী বাবুকে একবার দেখিলেই আমার ক্ষুধা যাইবে, আর কি খাইব? ডেপুটী বাবুর কথা চিন্তামণির বিশ্বাস হইল না। সে সেদিনও কিছুই গ্রহণ করিল না। অপরাহ্ণে ডেপুটী বাবু সকল কথা শ্রবণ করিলেন, এবং চিন্তামণির জীবনের আশঙ্কায় বেহারীলাল রায়ের সহিত দেখা করিতে জেলে পাঠাইয়া দিলেন।

তিন দিন মাত্র কারাগারে বাস করিয়া বেহারী সকলের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। বিহারীর সৎস্বভাবে জেলের কর্ম্মচারী হইতে কয়েদীগণ পর্য্যন্ত সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। এই তিন দিনের মধ্যে বেহারী জেলের প্রত্যেকের সহিত আলাপ করিয়াছেন। যাহার মধ্যে যেটী অভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহার সহিত সেই ভাবে কথা বলিয়া তাহাদের মনে প্রবেশ করিয়াছেন। তাহাদের কষ্টের সময় তাহাদিগের উপকারের জন্য একটী কথা বলে বা একটী সৎ পরামর্শ দেয় এমন লোক নাই, বেহারী পূর্ব্বেই এসকল জানিতেন। তাঁহার এই বিপদের সময় জীবনের একটী কর্ত্তব্য পালনের সময় পাইলেন; তিনি সমস্ত দিন জেলবাসীদিগের মনের উন্নতি, শরীরের উন্নতি, এবং জেল হইতে মুক্ত হইলে যাহাতে তাহাদিগের জীবন সৎপথে ধাবিত

হয়, এই সকল বিষয়ে আলাপ করিতেন। দুঃখী দরিদ্রদিগের সহিত সম আসনে বসিয়া ভাল কথা বলিলে তাহারা কি প্রকার বশ হয়, তাহা পল্লী-গ্রামবাসী অনেক সহৃদয় ব্যক্তি জ্ঞাত আছেন। এই প্রকারে তিন দিনের মধ্যে বেহারী সকলের ভালবাসা পাইয়াছেন। কিন্তু জেলের কর্ম্মচারীগণ কেন সন্তুষ্ট হইয়াছে? বিহারীলালের জেলে প্রবেশ করিবার দ্বিতীয় দিনে একটী কয়েদী জলে ডুবিয়াছিল, বিহারী তাহা দেখিতে পাইয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া তাহাকে তুলিয়া বাঁচাইয়া ছিলেন। এই ঘটনাটী যখন জেলের প্রধান কর্ম্মচারীগণ শুনিল, তখন সকলেই বেহারীর প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইল। মোট কথা, যাহার হৃদয় থাকে, এবং যাহার হৃদয় দুঃখী দরিদ্রদিগের জন্য ব্যাকুল, তাহাকে এ সংসারে কে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে? আর একটী কারণে সকলে বেহারীকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিল; বেহারীর মুখে সকল কথা শুনিয়া সকলেই বুঝিল যে বিহারী নির্দ্দোষী; কেবল দুঃখী দরিদ্রের উপকার করিতে যাইয়া এই প্রকার বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। ডেপুটী মাজেষ্ট্রেটকে সকলেই বদ্ লোকের শিরোমণি বলিয়া জানিত; তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে না পারিয়া সকলে গোপনে হৃদয়ের আবেগে বেহারীর দিকে ঝুকিয়া পড়িল। ঈশ্বরের রাজ্যে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি কি প্রকার অপ্রচ্ছন্ন ভাবে মানবের মন আকৃষ্ট হয়, তাহা দেখিলেও প্রাণে কত সুখ পাওয়া যায়।

যথা সময়ে চিন্তামণি বেহারীর নিকটে উপস্থিত হইল। তাহার দুনয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল। বেহারীলাল সস্নেহ দৃষ্টিতে গম্ভীর ভাবে চিন্তামণির পানে তাকাইয়া রহিলেন। মনের মধ্যে একটু বিস্ময়ের ভাব উপস্থিত হইতেছিল। ক্ষণকাল পরে বলিলেন;—তুমি কি প্রকারে মুক্ত হইয়া আসিলে? চিন্তামণি আপন মলিন বসনাঞ্চল দ্বারা চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন;—মুক্ত হই নাই, কেবল আপনাকে একবার দেখিবার অধিকার পেয়েছি। এই কথা বলিয়া আবার চিন্তামণি নীরব হইলেন; মনের মধ্যে শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, টস্ টস্ করিয়া চক্ষের জল পড়িয়া মৃত্তিকা সিক্ত করিতে লাগিল।

বেহারীলাল চিন্তামণির গভীর আত্মগ্লানি ও শোকচিহ্ন দেখিতে পাইয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর গম্ভীর ভাবে বলিলেন;—আমি জীবিত থাকিতে তোমার কি ভয়? তোমাকে উদ্ধার করা আমার জীবনের

একটী ব্রত। এ ব্রত নিশ্চয় পালন করব, ভয় কি তোমার? এই বলিয়া বেহারীলাল চিন্তামণির চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন।

চিন্তামণি গভীর শোক-সাগরে যেন একটু আশ্রয়তরী পাইলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন,—আমি,—এই কথা বলিতে বলিতে আবার বাক্ রোধ হইয়া আসিল, আর কথা বাহির হইল না।

বেহারী বলিলেন,—চিন্তামণি, আর চিন্তা করিবার সময় নাই, সন্ধ্যা প্রায় অতীত হইযাছে, এখন চল, আমি তোমাকে যে পথে যাইতে বলি সেই পথে যাও। যদি মান সম্ভ্রমকে তুমি এপর্য্যন্ত জীবন অপেক্ষা ভাল বাসিয়া থাক, যদি তোমার সতীত্বকে তুমি জীবনের সার ধন বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে নির্ভয়ে এস, আর বিলম্ব করিও না। আজ না হইলে আর হইবে না; এই বলিয়া বেহারী অগ্রে অগ্রে চলিলেন, চিন্তামণির আর ভাবিবার সময় রহিল না, মনে করিলেন বেহারী বাবুর সহিতই যাইতে হইবে; এই ভাবিয়া নির্ভয়ে চলিতে লাগিলেন। বেহারী আপন কুটীরে যাইয়া একখানি পত্র লিখিলেন; তার পর একটী ঘরে যাইয়া একজন লোককে ডাকিয়া আনিলেন। সে লোকের সহিত পূর্ব্বেই কথাবার্ত্তা এক প্রকার ঠিক ছিল। বেহারী সেই লোকটীর হাতে পত্র খানি দিয়া বলিলেন, তোমরা উত্তরদিকের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাও, সে দিকের প্রহরীকে আমার কথা বলিও, তবেই তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। চিন্তামণিকে বলিলেন, এই লোকের সহিত যাও, কোন ভয় নাই, এই ব্যক্তি তোমাকে যেখানে লইয়া যাইবে, সেই খানেই বেশ আদর পাইবে; আমি আমার মেয়াদের দিন শেষ হইলে সেইখানে যাইয়াই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব; কোন ভয় নাই। চিন্তামণির শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, পা যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, জীবনে কত কষ্টই আছে, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই অপরিচিত লোকের সহিত যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তারপর বেহারী বাবুকে বলিলেন, আপনার কথা অমান্য করিতে পারি না, তাই চলিলাম, কিন্তু জানি না অদৃষ্টে আবার কি ঘটে। এই বলিয়াই চিন্তামণি চলিলেন। রজনী ক্রমেই গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল, উর্দ্ধে নক্ষত্রমণ্ডলী মৃদু মৃদু জ্বলিয়া যেন পথিকদিগকে পথ দেখাইতেছে, আমাদের দুই জন পথিক সেই নক্ষত্রকে এক মাত্র পথ-প্রদর্শক করিয়া ভয় ভাবনা সকল ভুলিয়া চলিতে লাগিল। ইহারা কোন্ পথে অদৃশ্য হইল, কেহই জানিল না।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেহারী কে ?

প্রথম খণ্ডে যে সময়ের কথা বিবৃত হইয়াছে, তাহার ১০ বৎসর পরের অবস্থা ও ঘটনা আমরা এই খণ্ডে বর্ণনা করিব। এই দশ বৎসরের ঘটনা সমূহ আপাততঃ পাঠকগণের গোপন থাকিল।

এই সময়ে কলিকাতায় মহা আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, এক দিকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এক হস্তে সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা লইয়া কুসংস্কারের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অপর হস্তে সংস্কারের জীবন্ত উৎসাহ জলন্ত বহ্নির ন্যায় প্রজ্জলিত করিয়া হিন্দুসমাজের কুক্ষিস্থিত অন্ধকারকে পরাজয় করিয়া জ্ঞানা-লোক প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বিধবা বিবাহ যাহাতে দেশে প্রচলিত হয়, বাল্যবিবাহ যাহাতে দেশ হইতে উন্মূলিত হয়, কৌলিন্য-প্রথা যাহাতে আর সমাজের অস্থিমজ্জাকে ভেদ করিয়া শক্তি অপহরণ না করে, এজন্য চতুর্দ্দিকে আন্দোলন উঠিয়াছে। বক্তৃতায় বক্তৃতায় সহর অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; সভায় সভায় দেশ অতিশোভিত হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদপত্রে সুখের স্বপ্ন দেশকে মোহিত করিতেছে; গ্রন্থকারের উজ্জ্বল প্রতিভায় দেশ উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিয়াছে। একদিকে ব্রাহ্মসমাজে সংস্কার লইয়া আন্দোলন চলিতেছে; অন্যদিকে রাজনীতির কুহক মন্ত্রে যুবকমণ্ডলী দীক্ষিত হইয়া অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চীৎকার করিতেছে। এই সময়ে দুই তিনটী সভার নাম দিকদিগন্তরে বিঘোষিত হইয়াছে; পূর্ব্বে যাঁহারা সাহেবের অনুকরণ করিয়া জীবনকে সার্থক করিতেছিলেন, এক্ষণ তাঁহারা দেশ-সংস্কারক নাম ধারণ করিয়াছেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, ভারতবর্ষের এ শুভ সময়ের কথা বোধ করি সকলেরই স্মৃতিতে রহিয়াছে। দুর্ভাগ্য কিম্বা সৌভাগ্য বলিয়াই হউক, ভারতের পক্ষে এদিন চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

আমাদের কৃপানাথ বাবু এখন অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। ধর্ম্মসংস্কার ও রাজনীতির আন্দোলন, এ উভয়ের মধ্যেই তিনি আপনাকে

নিমজ্জিত করিয়াছেন, তাঁহার নাম, তাঁহার হৃদয়ের অমায়িকতায় অল্পে অল্পে অজ্ঞানিতরূপে দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার ভ্রাতা ব্রজনাথ বাবু আরো যশ ও সম্মান ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ড হইতে প্রথমে সিবিল সর্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের পদ পান। তিনি কেবল তিন বৎসর উক্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন, ঐ সময়ে তিনি এক জন দুর্দ্দান্ত প্রতাপান্বিত সাহেব বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন; বাঙ্গালী দেখিলেই ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। যদি কোন সময়ে ভ্রমবশতঃ কোন বাঙ্গালী তাহাকে বাবু বলিয়া সম্বোধন করিত, তাহা হইলে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া তাহার উপযুক্ত প্রতিবিধান করিতেন। কি সামাজিক কি নৈতিক, বাঙ্গালীর সকল অবস্থাকেই তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এই সময়ে তাঁহার নাম এই প্রকারে সকলের নিকট পরিচিত হয়; কিন্তু ঘটনাক্রমে কোন গুরুতর অপরাধে গবর্ণমেন্ট তাহাকে কর্ম্ম হইতে অপসৃত করেন। এই ঘটনায় তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়। এই সময় হইতে তিনি বাঙ্গালীর বেশ ধরিয়া দেশ সংস্কারের ব্রতে নিযুক্ত হন। কিছু দিন পরে কোন একটী সভা স্থাপিত হইলে, তিনি তাহার প্রাণরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে আপন বক্তৃতার গুণে দেশে আশাতীত সম্মান লাভ করেন। আজ ব্রজনাথ বাবুর নামে নিদ্রিত যুবকমণ্ডলী আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠেন। সময়ের পরিবর্ত্তনে এমনি ঘটিল যে, ব্রজনাথ বাবু কোন কোন বিষয়ে কৃপানাথ বাবু অপেক্ষাও অধিক সম্মান পাইলেন।

চিন্তামণি এখন কোথায় কি ভাবে আছেন, তাহা পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন। বেহারীলাল রায় এই দশ বৎসর পর্য্যন্ত কি ভাবে কোথায় সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন, তাহাও আপাততঃ গোপন রহিল। যে বৎসরের কথা বলা হইতেছে, এই বৎসর, তিনি কৃপানাথ ও ব্রজনাথ বাবু যে সভার জীবন স্বরূপ ছিলেন, সেই সভার কোন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

৪।৫ বৎসর হইল বিজয়গোবিন্দের পাঠ এক প্রকার শেষ হইয়াছে; তিনি বেহারীর সহিত একত্রিত হইয়া কৃপানাথ বাবু প্রভৃতির পরামর্শে আপন ভগ্নী গিরিবালাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছেন। সেই অবধি তাঁহার মাতুল পড়ার খরচ বন্ধ করিয়াছেন। সেই অবধি বিজয়ের

আত্মীয় বন্ধু বান্ধব পিতা মাতা সকলের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে। বিজয় এই কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত নানা প্রকার আর্থিককষ্টের মধ্যে পড়িয়াও এক প্রকারে পাঠ সমাপন করিয়াছেন,—বেহারীলাল তাঁহার এই দুরবস্থার সময়ে অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় সহায়তা করিয়াছেন। বিজয়গোবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গিরিবালা এই ৪।৫ বৎসরে কৃপানাথ বাবুর বিশেষ সহায়তায় স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া অনেকটা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন। এখনও তিনি তাহাদের নিকট পরম আদরে লালিত পালিত হইতেছেন।

বেহারীলাল রায়ের বাড়ী সুখদেবপুর;—ইনি বাল্যকাল হইতে বিদেশে থাকিতেন; ইহার বাড়ীর অবস্থা এক প্রকার মন্দ নহে। দেশে যে জমিদারী আছে, তাহাতে বৎসর পাঁচ ছয় হাজার টাকা মুনফা হইত; কিন্তু সে সকলের দিকে বেহারীর ততটা দৃষ্টি ছিল না। বেহারী পিতৃ মাতৃ হীন,—অতি শৈশবে বেহারীর সংসারের ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। পিতার দুই সহোদর আছেন, তাঁহাদের উপরই বাড়ীর সর্ব্বপ্রকার ভার, তাঁহারাই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। বেহারীলাল কলিকাতায় থাকিয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। বাল্যকাল হইতে বেহারীর ধর্ম্ম-পিপাসা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, সেই অবধি বাড়ীর মমতা এক প্রকার পরিত্যাগ করেন। বাড়ীতে গেলে খুল্লতাতদিগেয় তাড়নায় নানাপ্রকার পৌত্তলিক পূজায় যোগ দান করিতে হয়, এই কারণে প্রায় অনেক সময়েই কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেন, অবকাশের সময়েও দেশে যাইতেন না। বেহারীর আপন ভাই কিম্বা ভগ্নী কিছুই ছিল না, সুতরাং বাড়ী যাইবার জন্য ততটা আকর্ষণের কিছুই ছিল না। আমাদের উপন্যাস যে সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সে সময়ের পর আর বেহারীলাল স্কুলে যান নাই, নানা প্রকার বিপদের হাতে পড়িয়া বেহারীর কলেজ-অধ্যয়ন এক প্রকার বন্ধ হয়, কিন্তু বেহারীর ন্যায় যুবক কলেজে অধ্যয়ন না করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কারণ শিক্ষার অনন্ত-ক্ষেত্র ইহাঁর নিকট মুক্ত-দ্বার। বেহারীলাল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এ, ক্লাশ পর্য্যন্ত রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাল্যকালে বেহারীর বিবাহ দিবার জন্য বেহারীর খুল্লতাত প্রভৃতি অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু বিবাহকে নানা কারণে বেহারী অত্যন্ত ভয় করিতেন বলিয়া তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়। বাল্যকালে বেহারী ভাবিতেন,—বিবাহ একটা

মানসিক দুর্ব্বলতার ফল,—কারণ ভালবাসাকে একটু নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে আনিয়া আবদ্ধ করিতে হয়। তারপর যখন বয়সের সহিত জ্ঞানের দ্বার মুক্ত হয়, তখন ভাবিতেন—এ পৃথিবীতে মনের মানুষ না মিলিলে কাহাকে বিবাহ করিব? সৌন্দর্য্য, অর্থ, কুল, মান এ সকলকে বিবাহ করা অপেক্ষা না করা শতগুণে ভাল। বর্ত্তমান সময়ে বেহারীর বিবাহ সম্বন্ধে মত কি, তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন।

সুখদেবপুর কোথায় অবস্থিত, পাঠকগণের তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। সুখদেবপুরও যশহরের অধীন একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই গ্রামের নাম শুনা যায়;—সুখদেবপুরের নিম্নে একটী নদী প্রবাহিত আছে,—ঐ নদী বর্ত্তমান সময়ে কবতক্ষ নামে খ্যাত। সংক্ষেপে আমরা বেহারীলালের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একেই কি সভ্যতা বলে?

একটী লোক গঙ্গাতীরে গভীর বেদনায় অস্থির হইয়া অপরাহ্নে চিন্তা করিতেছেন। পাঠক, অনেকদিন পরে এ লোকের নিকট একবার উপস্থিত হইতে কি তোমার ইচ্ছা হইতেছে? যদি ইচ্ছা হয়, তবে চল; ক্ষণকাল দুঃখীর বিষাদের কাহিনী শুনিবে।

"এ পোড়া নয়ন অন্ধ হয় না কেন? এ সংসারের বিষাদের চিত্র দেখিয়া দেখিয়া হৃদয় মন অস্থির হইল, কিন্তু এ নয়ন অন্ধ হয় না কেন? এ নয়ন দুটী যদি অন্ধ হইয়া যাইত, তবে ত আর সে চিত্র,—সে মলিন চিত্র দেখিয়া দেখিয়া হৃদয় মন অস্থির হইত না! না—তাহা নহে। আমার কর্ণ বধির না হইলে আর আমার নিস্তার নাই! সে হৃদয়ের দুঃখ-ধ্বনি কে এ হৃদয়ে উপস্থিত করে? সে করুণ স্বর, যাহা শুনিয়া আমার প্রাণ আর সংসারের সেবায় রত থাকিতে পারিতেছে না, সে স্বর কে আমার প্রাণে ঢালে? সে ত নয়ন নহে। সে আমার কর্ণ। কর্ণ, বধির হও না কেন? আমার আর যে যন্ত্রণা সহ্য হয় না! যাহার জন্য জীবনের প্রায় একচতুর্থাংশ সময় ব্যয় করিলাম; যাহার বিদ্যা শিক্ষার জন্য জীবনে ভিক্ষার

ঝুলিকেও সার করিয়াছি, তাহার যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না! কি করিব, কোথায় যাই, উপায় কই? হায় আমি কি নরাধম, আমি কি নর-পিশাচ!! আমি যাহার উন্নতির জন্য এত যত্ন করিবার ভাণ করিয়াছিলাম, তাহার পরিণাম কি এই হলো!! ঈশ্বর, কোথায় তুমি! এ নরাধমের নিকট একবার উপস্থিত হও, তোমাকে দেখিয়া হৃদয় শীতল করি।"

মনে মনে এই প্রকার আক্ষেপ করিয়া ক্ষণকাল নিমীলিত-নয়ন হইয়া রহিলেন, ক্ষণকাল পরে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে একটী যুবক উপবিষ্ট। দেখিয়াই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন; পারিয়া সানন্দ চিত্তে বলিলেন, বিজয়, সংবাদ কি?

বিজয়গোবিন্দ ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে রহিলেন, কতকগুলি আশু বিচার্য্য বিষয় তাঁহার মনকে আন্দোলিত করিতেছিল, পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেন—পূর্ব্বে যদি জানিতাম, ইহার ফল এই প্রকার হইবে, তাহা হইলে কখনও এ ব্রত গ্রহণ করিতাম না, এখন আমি নিরুপায়, কোন ভাল উপায় দেখি না।

প্রথমোক্ত ব্যক্তি আপন হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, বিজয়, কেন নিরাশ হও, একদিনে কে কোথায় সংস্কারক হইয়াছে? এই ভয়ানক আন্দোলনের মধ্যে ঠিক থাকিতে পারিলে, তবে ত মনুষ্যত্ব।

বিজয়গোবিন্দ বলিলেন, তা সত্য বটে, কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে উভয় দিক ঠিক থাকে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রথমোক্ত ব্যক্তির এ প্রশ্নের উত্তর করিতে বিলম্ব হইল না, বলিলেন, উপায় এক, পথ এক, কেন নির্ব্বোধের ন্যায় অস্থির হও? যাহা সত্য, যাহা ন্যায়, তাহা চিরকাল জয়যুক্ত হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে সত্য ও ন্যায়ের পথ ভিন্ন আর পথ কোথায়?

বিজয়গোবিন্দ বলিলেন—আর সমাজ?

প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিলেন—সমাজ? যে সমাজ সত্য ও ন্যায় পথের সহায়, সে সমাজ অবশ্য মানবের কল্যাণকর। কিন্তু যে সমাজে সত্য ও ন্যায়ের আদর নাই, সে সমাজ পরিত্যাগ না করা কাপুরুষের কার্য্য। আমি মনে করিয়াছি, এইবার হইতে দলাদলির মূলচ্ছেদ করিতে জীবন ঢালিয়া দিব। অসাম্প্রদায়িকতার ভাণ করিয়া নূতন সম্প্রদায় গঠনের চেষ্টা! ছি, লোকে কি বলিবে? ধর্ম্মটা কি দেশে কথার কথা হয়ে উঠলো?

বিজয়গোবিন্দ।—কি করিয়া সত্য ও ন্যায় বাছিয়া লইব ? যে সমাজে এক জনের সত্য অন্যের নিকট অসত্য, সে সমাজে সত্য কি প্রকারে বাছিব ?

প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিলেন, সত্য যাহা তাহা এক, আপন বিবেক ও বিবেচনাশক্তির আদেশানুসারে পথে অগ্রসর হও ;—মনুষ্যের মুখচ্ছবি ভুলিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। পৃথিবীতে একাকী আসিয়াছ, একাকী যাইবে, ভয় কি ?

এই কথা সমাপ্ত হইলে বিজয়গোবিন্দ পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে দেখাইলেন ;—পত্র খানিতে এইরূপ লেখা ছিল।

"দাদা, তুমি ভিন্ন আমার আর গতি মুক্তি নাই। তুমি আমার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছ, তাহা আমি চক্ষের উপরে দেখিতেছি ; কিন্তু তুমি যাহার জন্য সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছ, তাহার জীবন বুঝি সুখের হইল না। এ দারুণ সংবাদ তোমার নিকট লিখিবার সময় কত কি ভাবিলাম !—ভাবিলাম, এ পত্র পাইলে দাদা পাগল হইয়া যাইবে। আবার ভাবিলাম, এই বিশ্বসংসারে আমি দাদার, দাদা আমার ; দাদা ভিন্ন আমার আর কে আছে ? দাদা ভিন্ন সমস্ত জগৎ সংসার আমার নিকট অন্ধকারময়। দাদা, তুমি মনে করিতে পার, আমি বিবাহের জন্য অস্থির হয়েছি। একথা তুমি যদি বল, তবে আর আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমি আর বিবাহ করিতে চাই না। যাহাকে আমার মন চায় না, যাহাকে দেখিলে আমার মনে ভয় হয়, তাহাকে জীবনের সঙ্গী করিতে হইবে, আগে জানিলে এ পথে আসিতাম না। ভালবাসার অর্থ ইহারা বুঝেন না। বলপূর্ব্বক কেহ কি কাহাকে ভালবাসাইতে পারে ? আমি এখন সকল দিক অন্ধকারময় দেখিতেছি। দাদা, তোমার সহিত কি আমার আর দেখা হইবে না ? আমি কি পাষাণময় হৃদয়ের দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছি ? প্রাণের দাদা, একবার দেখা দিও, দেখা দিয়া আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাইও ;—নচেৎ এ জীবন আর অধিক দিন এ সংসারে কলঙ্ক রটাইতে থাকিবে না। তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার প্রাণের গিরি তাহা হইলে, এসংসার ছাড়িয়া যাইবে।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিলেন, সব বুঝিতে পারিতেছি ; আর সহ্য করিতে পারি না, চল আমরা এখনই ব্রজনাথ বাবুর নিকটযাই।

ব্রজনাথ বাবু যখন যে অবস্থায় পড়িয়াছেন, জীবনে যখন যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে সকল প্রকার অবস্থাতেই বাল্যকালের অভিন্ন বন্ধু বেহারী-লালকে মনে রাখিতেন, কখনও তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই। বেহারীলালের পক্ষে ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা উপরে যে লোকটীর বিষয় বলিতেছিলাম, পাঠক অবশ্য বুঝিয়াছেন, উনিই বেহারীলাল রায়। বিহারীর জীবনে যত প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা তৃতীয় খণ্ডে বিবৃত হইবে; বেহারীলাল এখন ভিখারীর বেশ ধারণ করিয়াছেন।

ভিখারী বেহারী যথা সময়ে বিজয়গোবিন্দকে সঙ্গে করিয়া ব্রজনাথ বাবুর বাসায় উপনীত হইলেন। সেখানে যাইয়া উভয়ের মনোবাঞ্ছা একপ্রকার পূর্ণ হইল। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ব্রজনাথ বাবু বিজয়গোবি-ন্দের ভগ্নীর সহিত বসিয়া নির্জ্জনে কথোপকথন করিতেছেন।

বিজয়গোবিন্দ কে, এবং ইহার ভগ্নীর নাম কি, তাহা আমরা একবার বলিয়াছি। সুতরাং এখন হইতে বিজয়ের ভগ্নীর নাম ধরিয়া আমরা চলিব।

গিরিবালার এখন পূর্ণ বয়স। কলিকাতায় আসিয়া তিনি কি ভাবে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, সে সকল পর খণ্ডে বিবৃত হইবে। গিরিবালার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই; কারণ একমাত্র সেই সৌন্দ-র্য্যের জন্যই গিরিকে নানা প্রকার মনোকষ্টে দিনাতিপাত করিতে হইতেছে; এবং তাঁহার ভ্রাতা সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও ভগ্নীর মনে শান্তি দেখিতে না পাইয়া অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন। যে সৌন্দর্য্য মানুষকে পাপের পথে চালায়, সে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। গিরিবালার মনের কথা কি, তাহা আজ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট ব্যক্ত হয় নাই; কিন্তু ইহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ব্রজনাথ বাবুর সহিত তাঁহার যে বিবাহের কথা চলিতেছিল, তাহাতে তাঁহার সম্মতি নাই।

গিরিবালা জানিতেন, সংসারে অনেকেরই ভাগ্যে প্রকৃত বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। তিনি জানিতেন, অনেক স্থলেই আত্মায় আত্মায় মিলনের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার বাহ্য মিলনের নামই বঙ্গ প্রদেশে বিবাহ বলিয়া আখ্যাত। হিন্দু সমাজে সে মিলন কুলে, মানে, সম্ভ্রমে, এবং অর্থে। হিন্দুসমাজে যে কুলীন, সে মূর্খ হউক, নির্ধন হউক, সংসারের সকল প্রকার জ্ঞান-বিবর্জ্জিত

হউক, বঙ্গ প্রদেশে তাঁহার বিবাহের ভাবনা নাই; কুলের বাজারে তাহার জন্য সারি সারি পাত্রী অপেক্ষা করিতেছে। সেই কুলীন যদি ব্রাহ্মণ বংশীয় হয়, তবে তাহার ভাগ্য-লক্ষ্মী আরো প্রসন্ন, কন্যার বোঝা আসিয়া তাহার মস্তকে স্তূপাকৃত হইতে থাকে। গিরিবালা জানিতেন, বঙ্গ প্রদেশের কুলীন ব্রাহ্মণ কেহ কেহ ৫০ হইতে ১২০টী পর্য্যন্ত কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়া নিজ গৌরবে বসিয়া আছেন। এই প্রকার বিবাহ সকলেরই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবার যোগ্য। হিন্দু সমাজে আর এক প্রকার বিবাহ আছে, সে বিবাহ অর্থ-বিনিময়ের দ্বারা সমাধা থাকে। পাত্র পাত্রীর আর পরিচয়ের প্রয়োজন নাই,—পণ দ্বারা কন্যা ক্রয় করিতে পারিলেই হইল। হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত, এবং অধিকাংশ স্থলে অর্থ বিনিময়ের পণ, এমন স্থলে পাত্র পাত্রীর মন-মিলনের সম্ভাবনা কোথায়? গিরিবালা অতি অল্প বয়সে এসকল বিবাহের বিষের দ্বারা কোমল শরীরকে জর্জ্জরিত করিয়াছেন; সংসারের ভাল মন্দ তাহার আর বুঝিতে বাকী নাই। তিনি কি আর অর্থকে, মানকে বা বংশকে বিবাহ করিতে অগ্রসর হইতে পারেন? যদি তাহা পারিতেন, তবে তাঁহাকে আমরা সংসারের অতি অপকৃষ্ট জীব বলিয়া গণনা করিতাম। ব্রজনাথ বাবু বিদ্বান, কুল মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ, অর্থও যথেষ্ট আছে, কিন্তু গিরিবালার মন তবুও তাঁহাকে চায় না। কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, গিরিবালার তবে বুঝি রাজরাণী হইবার বাসনা আছে, তা না হলে এ প্রকার মন হবে কেন!! গিরিবালা রাজরাণী হইবার বাসনা রাখেন কি না, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। মন যাহা চায় না, তাহা তিনি আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে বাসনা করেন না। সংসারের লোকেরা তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ বা ঘৃণা করিবে, আশ্চর্য্য কি?

সংসারের লোকেরা কি চায়? সংসারের লোকেরা আপন আপন মতানুসারে জগতকে চালাইতে চায়? সভ্য সমাজের সে সকল অভাবের জন্য আমরা দিন রাত্রি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি, তন্মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীন মতের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন একটী প্রধান। সভ্য সমাজে—সংস্কৃত সমাজে সকলেই সকলকে আপন মতের দাস করিয়া রাখিতে চায়। কেবল তাহা নহে, যে ব্যক্তি আপন মতানুসারে চলে, অন্যের কথা শুনে না, সে ব্যক্তিকে কেবল ঘৃণার চক্ষে দেখা ত দূরের কথা, তাহাকে নানা প্রকারে অপদস্থ করিতেও ছাড়ে না। এই একটী কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নানা প্রকার অশান্তি

আসিয়া দেখা দিয়াছে। যাহার মত মতে যে না চলে, ব্রাহ্মসমাজে সেই তাহার ঘৃণার পাত্র; তাহার চক্ষে যে ব্যক্তি চিরকাল নিন্দার পদার্থ!! গিরিবালা যে সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সে সমাজে এই উদারতা(?)—মনুষ্য জীবনের এই প্রার্থনীয় আত্মগর্ব্বস্ব-জ্ঞানের আধিপত্য। যখন গিরিবালা সকল অধিনায়কদিগের মত উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আপন মতানুসারে চলিবেন, ঠিক করিলেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে সকলেই তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। কেবল তাহা নহে, সমাজে তাঁহার নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল,—সভায় যাওয়ার পথ রুদ্ধ হইল; তিনি এক মাত্র আপন মতের জন্য ব্রাহ্ম-সমাজে এক-ঘরে বা কারাবন্দিনী হইলেন। গিরিবালা কি করিবেন, এই বিপ-দের সময় ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাতের দ্বার যখন রুদ্ধ হইল, তখন তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। তাহার মনে রাত্রি দিন এই দুঃখের কথা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল—"বল পূর্ব্বক কি আমাকে বিবাহ দিবে? —আমি বিবাহ করিব না,—তবুও কি আমাকে ছাড়িবে না? এই যদি এই সমাজের ব্রত হয়, এই যদি এই সমাজের বিবাহের প্রণালী হয়, তবে কেন দাদা আমাকে এই সমাজে আনয়ন করিয়াছিল? দাদা তুমি কোথায়?" এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে দিন আসে দিন যায়, গিরি-বালার চক্ষের জল অজ্ঞানিত রূপে বক্ষে শুকাইয়া যায়। এই প্রকার মান-সিক দুশ্চিন্তায় গিরিবালার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিল। সোণার প্রতিমা দিন দিন কালির ন্যায় হইতে লাগিল। অবশেষে সহ্য করিতে না পারিয়া অতি কষ্টে গোপনে তিনি দাদার নিকট এক খানি পত্র লিখিলেন। সে জন্যও তাঁহাকে কত গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে। গিরিবালা মনে করি-তেছেন, ইহাপেক্ষা অসভ্য হিন্দুসমাজ সহস্র গুণ ভাল। গ্রন্থকার বলেন, যেখানে যত সুখের আশা, সেখানে তত দুঃখের চিত্র।

ভিখারী বিহারীলাল ও বিজয়গোবিন্দ যখন উপস্থিত হইলেন, তখন ব্রজনাথ বাবু গিরিবালাকে কি কথা বলিতেছিলেন, তাহা আমরা জানি না; তবে ইহারা সেদিন গিরিবালাকে যে প্রকার গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া-ছিলেন, সে প্রকার ভাব আর কখনও দেখেন নাই। ব্রজনাথ বাবু উভ-য়কে গ্রহণ করিয়া পার্শ্বস্থিত বেঞ্চ খানিতে বসাইলেন, বলা বাহুল্য যে আপনি একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার তাহাতেই উপবিষ্ট হই-

লেন। গিরিবালা কারাবাসিনী, ব্রজনাথ বাবুর ইঙ্গিতে দুঃখিত অন্তরে সেস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন।

ভিখারী বেহারীলাল নম্রভাবে বলিলেন, আপনাদের সভ্যতা ও সংস্কারের পথ প্রশস্ত দেখিয়া আমরা হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছি। আপনার দাদাকে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু তিনি বড় লোক, সংসারের সকলি তাঁহার অনুকূল, তিনি আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন কেন? আপনার নিকট আজ বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি, আপনি এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন! যে পথে চলিয়াছেন, এ পথে আপনি সুখী হইতে পারিবেন কি না সন্দেহ, এবং অন্যের দুঃখের সীমা নাই, সুতরাং এ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া প্রকৃত বিবেকীর কার্য্য। আপনি গিরিবালার হৃদয়ের ভাব সকলি জানেন। আপনি কি মনে করেন, আপনি এই কাজে সুখী হইতে পারিবেন?

ব্রজনাথবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। সে হাসির অর্থ কি, আমরা জানি না, কিন্তু ভিখারীর হৃদয়ে তাহাতে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। বেহারী বুঝিলেন, ব্রজনাথ বাবু তাহার কথাকে উপেক্ষা করিতেছেন।

ব্রজনাথ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সুখ, অসুখ আমরা বুঝি না; তবে মন যাহা চায়, তাহা পাইতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

বেহারী বলিলেন, গিরিবালা কি আপনাকে চায়?

ব্রজনাথ বাবু।—চায় না, তাহা বলিতে পারি না।

বেহারী।—এই অনুভূতির মধ্যে কি ভুল নাই?

ব্রজনাথ বাবু।—ভুল থাকুক বা না থাকুক, তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই, আপনি স্মরণ রাখিবেন, গিরিবালা এখন আমাদের হাতে।

বেহারীর সর্ব্বশরীর দুঃখ ও ক্রোধে অধীর হইল, কথা বলিবার সময় তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল,—বলিলেন,—এ সকলি আপনাদের পক্ষে সম্ভব, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। সভ্যতা ও সংস্কারের নামে এসকলই বিকাইয়া যাইতেছে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। গিরিবালাকে কষ্টের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া আপনাদের নিকটে সুখে থাকিবে বলিয়া রাখিয়াছিলাম; এখন দেখিতেছি সে কষ্টও গিরিবালার পক্ষে সুখের ছিল। গিরিবালাকে এক বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া কখনই অন্য বিপদে ফেলিয়া রাখিব না; আপনি স্মরণ রাখিবেন; বিপন্নের সহায় ঈশ্বর।

ব্রজনাথ বাবু বলিলেন,—আপনার পরাক্রম বিশেষ রূপে জানি; চিন্তামণিকে উদ্ধার করেন নাই?

বেহারীর হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, সে জন্য সাহস করিবেন না। কাপুরুষের ন্যায় কার্য্য করিয়া সে জন্য বাহাদুরি করা মনুষ্যত্ব নহে। আমি জানি, চিন্তামণির শাপে অনন্তকাল আপনাদিগকে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।

ব্রজনাথ বাবু বলিলেন,—এখন আপনারা বিদায় গ্রহণ করুন, আপনাদিগের কথায় আমি অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছি, এ সকল কথাই দাদাকে বলিব।

বেহারীলাল বলিলেন,—আমরা এখনই বিদায় লইতেছি, কেবল একটী ভিক্ষা চাই—গিরিবালার সহিত একবার আমাদিগকে দেখা করিতে দিন।

ব্রজনাথ বাবু বলিলেন,—তা কখনই হইবে না, তা কখনই হইবে না, এই বলিয়া তিনি গর গর করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ক্ষণকাল পরে ব্রজনাথ বাবুর দ্বারবান আসিয়া বেহারী ও বিজয়গোবিন্দ বাবুকে বলিল,—আপনারা এস্থান হইতে প্রস্থান করুন।

ভিখারী বেহারী ও বিজয়, সভ্যতা, সংস্কার ও ভদ্রতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সে স্থান হইতে অগত্যা উঠিয়া আসিলেন। পাঠক, ইংরাজি শিক্ষা, ধর্ম্মজ্ঞান ও সভ্যতার কি শোচনীয় পরিণাম, দেখ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বল-প্রয়োগ।

সেই দিন রাত্রেই ব্রজনাথ বাবুর বাড়ীতে দস্যু পড়িল। ব্রজনাথ বাবু বেহারীকে সামান্য ভিখারী জ্ঞান করিয়া ক্ষমতাশূন্য মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু রজনীতে সে ভ্রম দূর হইল। চিন্তামণির সময়ে বেহারীলাল পূর্ব্বে সংবাদ পান নাই, নচেৎ সে কাহিনী অনেক রূপান্তরিত হইত। ব্রজনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিজয়গোবিন্দ ও বেহারী বিষণ্ণ মনে যখন গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ কতকগুলি পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সে সকলের বাড়ীই পূর্ব্বাঞ্চলে, তাহাদের মধ্যে অধিকাং-

শই বেহারীলালদিগের প্রজা। বেহারীর বর্ত্তমান বেশ ধারণ জন্য দেশের সকলেই আন্তরিক দুঃখিত ছিলেন। বেহারী দেশের কাহারও নিকট কখন কিছুই প্রার্থনা করেন নাই; অদ্য ইহাদিগের সহিত সাক্ষাতের পরেই সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন, তারপর অনুরোধ করিলেন, অদ্য রজনীতে তোমরা আরো কতকগুলি লোক লইয়া আমাদের বাসায় যাইও; আমি রাত্রে যাহা বলিব, তাহা করিতে হইবে। বেহারীর এই অনুরোধে সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া যথা স্থানে গমন করিল। বেহারী ও বিজয় বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। বাসায় আসিয়া গিরিবালাকে আনিয়া কোথায় রাখা হইবে, এই সকল বিষয়ে অনেক চিন্তা করিলেন; অনেক বিবেচনার পর ঠিক হইল যে, সেই দিন রাত্রেই বিজয় গিরিবালাকে লইয়া মুঙ্গের যাত্রা করিবেন, সেখানে বেহারীলালের একজন বন্ধু ছিলেন, তিনি এই সময়ে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিবেন, ইহা বেহারী উত্তমরূপে জনিতেন। বেহারী তাহার নিকট একখানি পত্র লিখিয়া রাখিলেন, এবং আনুষঙ্গিক যাহা প্রয়োজন ছিল, সকল ঠিক করিয়া রাখিলেন।

সন্ধ্যার পরেই বেহারীলালের বাসা লোকে পরিপূর্ণ হইল; বেহারীলাল সমস্ত লোকগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় অপেক্ষা করিতে বলিলেন, সকলকেই সঙ্গে অস্ত্র লইতে নিষেধ করিলেন; মাত্র আপন হাতে একটী পিস্তল লইয়া চলিলেন। বিজয়গোবিন্দকে একখানি গাড়ী লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে বলিলেন। রাত্রি ১০টার সময় বেহারী সঙ্গে ৩০ জন লোক লইয়া ব্রজনাথ বাবুর দ্বারে উপস্থিত হইলেন, লোকদিগকে একটু পশ্চাতে পশ্চাতে থাকিতে বলিলেন। দ্বারে যাইয়া দ্বারবানকে ডাকিলেন। দ্বারবান প্রথম দ্বার খুলিতে চায় নাই, পরে বেহারীলালের স্বর শুনিয়া অনেকক্ষণ পর দ্বার খুলিল। সেই দিন প্রাতে ব্রজনাথ বাবু যতই অনাত্মীয়তার ভাব প্রদর্শন করুন না কেন; দ্বারবান জানিত, বেহারী ব্রজনাথের একজন বিশেষ বন্ধু; সে বেহারীকে দেখিয়া দ্বার খুলিল। গৃহে যাইবার সময় সঙ্গের লোকদিগকে বেহারী বলিলেন, তোমরা গোপনে দ্বারে অপেক্ষা কর, আবশ্যক হইলে যখন তোমাদিগকে ডাকিব তখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করিবে। গৃহে যাইয়া ব্রজনাথ বাবুকে গম্ভীরভাবে বলিলেন, সভ্যতা ও ধর্ম্মের নামে আপনাকে সবিশেষ অনুরোধ করিতেছি, আপনি গিরিবালাকে ছাড়িয়া দিন।

ব্রজনাথ বাবু বেহারীর সে প্রকার গম্ভীর বিরাট মূর্ত্তি আর কখনও নিরীক্ষণ করেন নাই ;—বেহারী আজ আর পূর্ব্বের বেহারী নন্। দেখিয়াই তাঁহার হৃদয়ে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল, বলিলেন,—বেহারী বাবু, আজ সকালে আপনাদের সহিত অত্যন্ত অভদ্রভাবে ব্যবহার করিয়াছি, সে জন্য আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে, আপনি সে জন্য ক্ষমা করিবেন।

বেহারী বলিলেন,—এখনও যদি গিরিবালাকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আমি সকল ভুলিয়া যাইব।

ব্রজনাথ বাবু তখনও কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, বলিলেন, আপনি গিরিবালার কে যে, আপনার সহিত তাহাকে যাইতে দিব ?

বেহারী বলিলেন,—বলেন ত তাহার ভ্রাতাকে এখনই উপস্থিত করিতে পারি, এই বলিয়াই দ্বারে যাইয়া বিজয়গোবিন্দকে লইয়া আসিলেন।

এখনও ব্রজনাথ বাবু কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, বলিলেন, গিরিবালার শত শত ভাই আসিলেও গিরিবালাকে ছাড়িয়া দিব না।

বেহারী বলিলেন,—আমাদিগকে একেবারে ক্ষমতাশূন্য মনে করিবেন না; কলিকাতায় অবশ্য অর্থে আপনারা বড় লোক, কিন্তু আমাদিগকে একেবারে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিবেন না। ন্যায় অন্যায় বিচারের ভার এখনও আপনার উপর দিতেছি। কিন্তু যদি দেখি আপনি অন্যায় ও অবৈধ আচরণ দ্বারা বলপূর্ব্বক গিরিকে রাখিতেছেন, তাহা হইলে আজ মহাকাণ্ড ঘটিবে। আপনি এখনও ন্যায় ধর্ম্মের অনুরোধে গিরিকে তাহার ইচ্ছার পথে যাইতে দিন।

ব্রজনাথ বাবু বলিলেন,—গিরিবালা এখনও বালিকা বইত নয়, তাহার আবার ইচ্ছা আর অনিচ্ছা কি ? আমাদের ইচ্ছাই তাহার ইচ্ছা।

বেহারী বলিলেন,—আপনার ইচ্ছা কি ?

ব্রজনাথ।—কখনই ভিখারীর সহিত গিরিবালাকে যাইতে দিব না।

বেহারী।—ভিখারী গিরিবালাকে নিতে চাহে না ; তাহার ভ্রাতা বিজয়গোবিন্দের সহিত যাইতে দিবেন কি না ?

ব্রজনাথ।—তাহাও দিব না, কারণ বিজয় একজন স্কুলের ছাত্র ; সে এখন ভিখারীর পরামর্শমতে চলিতেছে বলিয়া এই প্রকার করিতেছে, নচেৎ কখনই গিরিবালাকে নিতে চাহিত না।

বেহারী।—বিজয়গোবিন্দের বুদ্ধি বা জ্ঞান আপনার অপেক্ষাও কম মনে করিতেছেন ? তা যাই হউক, আমরা যদি বলপূর্ব্বক গিরিবালাকে গ্রহণ করি ?

ব্রজনাথ বাবু হাসিয়া ফেলিলেন, তারপর বলিলেন, তা আপনারা পারেন বই কি?

বেহারীলাল 'তবে দেখুন', এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বিজয়-গোবিন্দও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। তাঁহারা যে ঘরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই ঘরের পার্শ্বে একটী ঘরে গিরিবালা বসিয়া কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেছিলেন, তাহা গিরিবালা পূর্ব্বে ইঙ্গিত দ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বেহারী একেবারে সেই ঘরের দরজা খুলিলেন, তারপর বিজয়গোবিন্দকে বলিলেন—বিজয়, গিরিবালার হাত ধ'রে তুমি ল'য়ে এস।

ব্রজনাথ বাবু এতক্ষণ যেন কল্পনার চিত্র দেখিতেছিলেন, কিন্তু যখন বিজয় গিরিবালার হাত ধরিল, তখন দ্বারবানকে ডাকিলেন, এবং পাহারাওয়ালাকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন, এবং আপনি উন্মত্তের ন্যায় গিরিবালাকে ধরিতে অগ্রসর হইলেন।

বেহারী বাহিরের লোকদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। যে লোক পাহারা-ওয়ালাকে ডাকিতে যাইতেছিল, সে লোক দ্বারে বেহারীর লোকের দ্বারা আবদ্ধ হইল। বেহারীর ইঙ্গিত মাত্র সমস্ত লোক বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। ব্রজনাথ বাবুকে গিরিবালার সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বেহারী বলিয়া উঠিলেন,—তবে রে পাজি, এত বড় আস্পর্দ্ধা? আমাদের সম্মুখে তুই গিরির গায়ে হাত দিবিত এখনি তোর মুণ্ডচ্ছেদ করিব। তুই ধর্ম্মের নামে এতদিন যাহা করিয়াছিস্, তাহা সকল সহ্য করিয়াছি; কিন্তু তাই বলিয়া আজ আর তোর নিস্তার নাই; এই বলিয়া ব্রজনাথকে ঘুষি মারিয়া ফেলিয়া দিলেন। দ্বারবান 'ক্যা হ্যায় ক্যা হ্যায়' বলিতে বলিতে বেহারীকে ধরিতে আসিল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বাড়ীর ভিতরে যখন প্রায় ৫০।৬০ জন প্রবেশ করিল, তখন সকলেই অবাক হইল; দ্বারবান ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া বেহারীকে বলিল—যো হুকুম হুজুর। বেহারী বিজয় ও গিরিবালাকে লইয়া বহির্গত হইয়া গাড়ী আরোহণ করিলেন। বেহারীর সকল লোক জন ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে ব্রজনাথ বাবুর বাড়ী লুণ্ঠন করিয়া চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। ব্রজনাথ বাবু আজ অপ-মানে, লজ্জায় ও আঘাতে মৃতবৎ হইয়া গৃহে পড়িয়া রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানুষ ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত ?

মানুষ ভ্রান্ত, মানুষ অভ্রান্ত। মানুষ ভ্রান্ত, কারণ অনেক সময়ে দেখা যায়, আজ যাহা মানুষ করিতেছে, কল্য তাহার দ্বারা জগতের কোন প্রকার উপকারের পরিবর্ত্তে কেবলই অপকার হইতেছে। মানুষ ভ্রান্ত, কেননা ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পৃথিবীতে পাওয়া গিয়াছে, কিছু কাল পূর্ব্বে যাহা লোকে করিয়া গিয়াছে বা বলিয়া গিয়াছে, সময় সহকারে কিছুকাল পরে তাহাতে যথেষ্ট ভুল আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানুষ ভ্রান্ত,কারণ মানুষ অপূর্ণ জীব—সীমাবদ্ধ ইহার জ্ঞান, সীমাবদ্ধ ইহার সকল। মানুষ ভ্রান্ত, তাই পৃথিবীতে একজনের কর্ত্তব্য,অপরের অকর্ত্তব্য,একজনের ধর্ম্ম অন্যের নিকট অধর্ম্ম, একের মত অপ-রের নিকটে পাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আবার অন্যদিকে মানুষ অভ্রান্ত, কারণ কোন কোন স্থলে একদিন মানুষ যাহা করিয়া গিয়াছে, সেই প্রণালীতে চিরকাল অন্যান্য মানুষ কার্য্য করিতেছে ; তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, তাহার দ্বারা চিরকাল সমভাবে জগতের উপকার হইতেছে মানুষ। অভ্রান্ত,— কেন না মনুষ্যের দ্বারা এমন কতকগুলি সত্য পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা সত্য বলিয়া শতাব্দী হইতে শতাব্দী পর্য্যন্ত মানুষের দ্বারা সমান ভাবে আদৃত হইতেছে।—মানুষ অভ্রান্ত, কারণ পৃথিবীতে দেখা যায়, কতকগুলি বিষয়ে পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সর্ব্ব কালের একমত সকল মানুষের হৃদয়ে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে।

তবেই বুঝা যাইতেছে, মানুষ অনন্ত ভ্রান্ত নহে, মানুষ অনন্ত অভ্রান্তও নহে। কতকগুলি লোক এসংসারে কেবল ভ্রান্তিবাদ ঘোষণা করিয়া আত্ম-জীবনে বিনয়ের প্রতিবিম্ব দেখাইয়া সুখ বা তৃপ্তি লাভ করেন, আমরা বলি তাঁহাদের ন্যায় মূল ও অবলম্বন শূন্য জীব এ ভূমণ্ডলে আর নাই। আমি আছি -এই যে কত প্রকার চিত্র দেখিতেছি,—নক্ষত্র মাথার উপরে,— সমুদ্র, বৃক্ষ, লতা অধঃস্থলে ; এই যে আমি যাইতেছি কত দেশদেশান্তরে এই যে কথা বলিতেছি,—এ সকলই ভ্রম পূর্ণ ;—অর্থাৎ এ সকলেই ভুল থাকিতে পারে ; যাহা করিয়াছি,—যাহা অবলম্বন করিয়া করিতেছি,

এ সকলেই ভুল থাকিতে পারে। এ ধারণা, এ সিদ্ধান্ত মনুষ্যের উন্নতির অত্যন্ত প্রতিরোধক; কারণ আমি শরীর পুষ্টির জন্য আহার করিতেছি,—ইহাতেও ভুল আছে বলিয়া যদি আমি আহার না করি, তবে শরীর ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মন, উভয়ই বিনষ্ট হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই প্রকার ভ্রান্তজীবের ন্যায় চঞ্চল ও অসুখী জীব ভূমণ্ডলে আর নাই।

আর এক শ্রেণীর লোক পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা বলেন, মানুষ একেবারে অভ্রান্ত হইতে পারে। মানুষ একেবারে অভ্রান্ত হইলে তাহাতে আর ঈশ্বরে কোন পার্থক্য থাকে না; এই জন্য তাঁহারা বলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যাকারে ঈশ্বর সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। আমরা বলি, এ সকলি ভ্রান্ত জীবের কথা, কারণ, যে হস্তপদ বিশিষ্ট মানুষ চিরকাল সীমাবিশিষ্ট, সেই মানুষ কি প্রকারে অনন্ত অভ্রান্তের অধিকারী হইবে? আমরা বলি, যাঁহারা বলেন মানুষ কেবল ভ্রান্ত, আর যাঁহারা বলেন মানুষ একেবারে অভ্রান্ত, এই উভয় শ্রেণীর লোকই ভ্রান্ত।

আমি যদি কেবলই ভ্রান্ত হই—তবে জীবনের প্রথম দিন হইতে যাহা দেখিয়াছি, তাহা আর অন্য রকম দেখি না কেন, বাল্যকালে বাহ্য জগতকে যে প্রকার দেখিয়াছি, আজিও সেই প্রকার দেখি কেন,—বাল্যকালে অন্ন প্রভৃতি যে প্রকার শরীরের পুষ্টিসাধন করিত, অদ্যও সেই প্রকার পুষ্টি-সাধনে রত কেন;—যৌবনকালে যে প্রকার ঈশ্বরজ্ঞান ছিল, এপর্য্যন্ত কেন সেই জ্ঞান সেই প্রকারই রহিয়াছে,—বাল্যকালে যে সকলকে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, আজও তাহা মিথ্যা হইল না কেন? সত্য কথা বলা উচিত, জিতে-ন্দ্রিয় হওয়া উচিত প্রভৃতি কথাতে কেন ভ্রম পাইলাম না? আবার অন্য দিকে, আমি যদি কেবলই অভ্রান্ত হইব, তবে আজ যাহা মঙ্গলকর বলিয়া বুঝিতেছি, কল্য পুনঃ তাহাতে অমঙ্গল ঘটিতেছে কেন? এক দিন আমি যাহা ভাল বুঝিয়াছি, কোন কোন সময়ে তাহা আবার অন্যায় বলিয়া বুঝি কেন? মানুষ কেবল অভ্রান্ত হইলে, মানুষের দ্বারা জগতের ঘোরতর অনিষ্ট হইবে কেন;—এক সময়ের কার্য্যের জন্য মানুষ অন্য সময়ে অনুতাপ করিবে কেন,—অন্য সময়ে চক্ষের জলে তাহার বক্ষ ভিজিবে কেন? আবার বলি, মানুষ কেবল অভ্রান্ত হইলে এক সময়ে একজন সিংহাসনে বসিয়া অন্য সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিবে কেন,—বা একসময়ে একজন উদাসীন থাকিয়া আবার অন্য সময়ে সিংহাসনের লালসায় অস্থির হইয়া ফিরিবে কেন?

আমরা বলি, মনুষ্যের চরিত্রে বিধাতার লীলা যে টুক সেই টুকই অভ্রান্ত, মনুষ্যের চরিত্রে মনুষ্যের লীলা যে টুক, সেই টুকই ভ্রম-পূর্ণ।

ব্রজনাথ বাবু যে কার্য্যকে জীবনের মঙ্গলকর বলিয়া তাহাতেই উন্মত্ত হইয়াছিলেন,—বিবাহের মূলের দুই বিন্দু—আত্মার মিলন বা ধর্ম্মযোগ, শরীরের কামনা বা ভালবাসা, এই দুই বিন্দুকে ভুলিয়া বাহ্য-জ্ঞান-শূন্যের ন্যায় যে পথে অগ্রসর হইতেছিলেন,—বিহারীলাল সে কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইলেন, সে মিলনের আশার মূলে আঘাত করিলেন। এই দুইটীই মনুষ্যের কার্য্য, এই দুইটী কার্য্য-প্রণালীই অভ্রান্ত হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে উভয়ের মত এত বিরোধী হইত না। ইহার মধ্যে কে ভ্রম দ্বারা চালিত হইতেছিলেন, আমরা সে মীমাংসা এস্থলে করিব না, কিন্তু ইহা স্থির সিদ্ধান্ত, যে বিষয়ে যে ব্যক্তি জগতে অভ্রান্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারে, সে বিষয়ে সে ব্যক্তি কখনও কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে না। পৃথিবীতে জয়ী বীর সে, যাঁহার মধ্যে বিশ্বাসে অটলত্ব আছে,—সংশয় তাঁহার সন্নিকট হইতে সর্ব্বদাই দূরে অবস্থিতি করে।

পরদিন বিহারীলাল আপন বাসায় অটল ভাবে বসিয়া আছেন। নির্ভীক বিহারী আজ নিশ্চিন্ত। কতদিন যাহার দারুণ চিন্তার সেবা করিতে গত হইয়াছে;—কত রজনী যাহার দুশ্চিন্তায় জাগরণ করিতে হইয়াছে, আজ সেই বিহারী নিশ্চিন্ত। বিহারীর চিত্তের প্রসন্নতা চিরকাল একই ভাবে থাকিত, বিহারী অতি কষ্টে পড়িয়াও কাতর হইতেন না। নানা প্রকার অবস্থার পীড়নে তাহার এই শিক্ষা লাভ হইয়াছে যে, সংসারের যে ব্যক্তি নিজ মনের শান্তিতে থাকিতে পারে, সেই প্রকৃত সুখী, নচেৎ পৃথিবীর কোন পদার্থে মানুষকে সুখ দিতে পারে না। এই শিক্ষাবলে তিনি সর্ব্বদাই সুখী থাকিতেন, তাহার চিত্ত যেন সর্ব্বদাই প্রসন্ন। যাহা বলিতেছিলাম, চিরপ্রসন্ন বিহারী আজ নিশ্চিন্ত, স্থির ভাবে বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছেন।

" চিন্তামণি!

আজ তোমাকে একটী শুভ সংবাদ দিতে লেখনী ধরিয়াছি, নচেৎ এ পোড়া লেখনী আর ধরিতাম না। তোমার বর্ত্তমান কষ্টের সময়ে একটী শুভ সংবাদ পাইলে অনেক উপকার হইবে, ইহা মনে করিয়াই কলম ধরিলাম। গিরিবালাকে আমরা কল্য উদ্ধার করিয়াছি,—আপোষে নহে, বল-প্রয়োগে।

গিরিবালা ও বিজয়গোবিন্দকে কল্যই মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিয়াছি, সেখানে মাত্র কয়েক দিন থাকিবে। তারপর কোথায় থাকিবার বন্দোবস্ত হইবে. তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি বিজয়গোবিন্দের জন্য একটী কর্ম্মের যোগাড় করিতেছি। আর একটী সুখের সংবাদ আছে,—আমি যে সভার কার্য্যে লিপ্ত ছিলাম, সেই কার্য্য আমি পরিত্যাগ করিয়াছি, আমার ইচ্ছায় এবং ব্রজনাথ বাবু ও কৃপানাথ বাবুর বিশেষ অনুগ্রহে। আমার দ্বারা দেশের বড় একটা সভার বড় বড় কার্য্য সম্পন্ন হইল না বলিয়া দুঃখিত হইও না, আমি যাঁহাদের পদধূলি মস্তকে পাইলে কৃতার্থ হই, তাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তুমি সর্ব্বদাই আমার কার্য্যের প্রশংসা করিতে, এতদিন পর সে কথার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, অদ্য উক্ত সভার এক অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সভা আমার গত কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তুমি ভ্রান্ত জীব, তোমার কথা খাটিল না। আর একটী কথা—আমি ভিখারীর বেশ ধরিয়াছি,—হাসিও না, বাস্তবিক আমি ভিখারী হইয়াছি, আজ হতে আমাকে তুমি ভিখারী বলিয়া ডাকিও। চিন্তামণি! তোমাকে আমার জীবনে দুটী মাত্র অনুরোধ,—যখন যে অবস্থায় থাক, তাহাকেই সুখের বলিয়া মনে করিও, এবং সংসারের সকল চিন্তাকে দেশের মঙ্গলের দিকে ফিরাইয়া আনিও। মানুষ চেষ্টা করিলে সংসারের অনেক উপকার করিতে পারে। যে মনে করে আমি ক্ষুদ্র, ক্ষমতাশূন্য, অর্থশূন্য, আমার দ্বারা দেশের কি কার্য্য হইবে, সে অলস, অকর্ম্মণ্য। মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। আপন অবস্থা লইয়া পৃথিবীর কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী সকলেই ব্যস্ত, যদি আপন অবস্থা ভুলিয়া দেশের কল্যাণ কামনাকে জীবনের সার ব্রত করিতে না পারিলে, তবে আর মানুষ হইয়াছিলে কেন? আমি সত্যই বলিতেছি, পরকে যে আপন না ভাবে, তার জীবন বৃথা। যে পরের জন্য ভাবে, পর তাহার আপন হয়; শত্রু তাহার মিত্র হয়। তুমি যে জন্য আক্ষেপ কর, সে জন্য আমি আজ কাল আর আক্ষেপ করি না, কারণ, এ সম্বন্ধে আমার অভ্রান্ত বিশ্বাস নাই,—থাকিলে তোমার এ দশা হইত না। তুমি আজ যাঁহার, তিনি কালে তোমার হউন, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি।

তোমার স্নেহের—বিহারী।

পত্র খানি সমাধা করিয়া একবার পাঠ করিলেন, পাঠান্তে একটু চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কতকগুলি লোক সহসা তাহার ঘরে প্রবেশ করিল।

বিহারী সচকিতে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে ব্রজনাথ বাবু ও কৃপানাথ বাবুও রহিয়াছেন। তিনি সাদরে ও সসম্মানে সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া উপবেশন করাইলেন, এবং আপনি এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বলা বাহুল্য, কৃপানাথ বাবুর সহিত যাহারা আগমন করিয়াছিল, তাহাদের সকলের আকৃতিতেই বিরক্তি, ক্রোধ ও ঘৃণার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল।

কৃপানাথ বাবু ক্ষণকাল পরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন, বিহারী বাবু, আমরা পূর্ব্বে আপনাকে বিবেচক ও চিন্তাশীল বলিয়া জানিতাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আপনার ন্যায় অপরিণামদর্শী লোক আর নাই। আমরা যদি আপনার ন্যায় হইতাম, তা হলে আজ এতক্ষণ হয়ত আপনাকে পুলিশের ঘরে থাকিতে হইত। সে যাহা হউক, আপনি যাহা করিয়াছেন, সে জন্য আপনার অনুতপ্ত অন্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। গিরিবালার পক্ষে ইহা-পেক্ষা আর কি মঙ্গলকর হতে পারে, এবিষয়টা একবার ভাবুন। পথের কাঙ্গালিনী রাজরাণী হবে, একথা বল্লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

এই কথা বলা শেষ হইতে না হইতেই বিহারীলাল বলিতে আরম্ভ করি-বেন, এমন সময়ে কৃপানাথ বাবু বলিলেন, আমার কথাটা শেষ হউক, তারপর আপনার যাহা ইচ্ছা, বলিবেন।

দলের একজন বলিলেন—আচ্ছা বিহারী বাবুই বলুন।

বিহারী বাবু বলিলেন—আমি যে কেবল বুদ্ধি, বিবেচনা, জ্ঞান ও বিদ্যা-তেই আপনাদের অপেক্ষা হেয়, তাহা নহে; অর্থ এবং মান মর্য্যাদায় আমি আপনাদের নিকটে চন্দ্রের নিকট জোনাকীর ন্যায়; এ সকলি আমি জানি। আমি বুদ্ধিহীন, অবিবেচক, একটা বর্ব্বর, তাহা বেশ জানি। এতক্ষণ হয়ত আমি কারাগারে থাকিতাম, একথা যে বলিলেন, সে জন্য আমি ভীত বা কাতর নহি; কারণ কর্ত্তব্যের অনুরোধে এজীবনে কারাবাসকেও একদিন সুখের বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলাম, আবার নয় করিব। আমি ক্ষমা প্রার্থনা বা অনুতাপ করিব কি জন্য, বুঝিতে পারিতেছি না। স্পষ্ট করিয়া বলিলে ভাল হয়। গিরিবালা পথের কাঙ্গালিনী, পৃথিবীতে একমুষ্টি অন্ন দেয় এমনই বা তার কে আছে? এস্থলে ব্রজনাথ বাবুর সহিত তাহার বিবাহ হইলে যে সে রাজরাণী হইত, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু সে বিষয় আমরা তর্ক যুক্তির দ্বারা কিরূপে মীমাংসা করিব? গিরিবালা কাঙ্গালিনী, এই অবস্থায়ই তাহার নিকট ভাল, সে রাজরাণী হতে চায় না; এরূপ স্থলে

বলপূর্ব্বক তাহার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করা আমি নীতি ও ন্যায় বিরুদ্ধ মনে করি। গিরিবালাকে বিপন্ন দেখিয়া ন্যায়ের অনুরোধে তাহাকে বলপূর্ব্বক আনিয়াছি; এজন্য বিন্দু মাত্রও আমার অপরাধ হয়েছে মনে করি না।

কৃপানাথ বাবু।—আজ সে যাহা মন্দ বুঝিতেছে, কল্য হয় ত তাহা ভাল বোধ হইবে। অদ্য যাহাকে সর্পের ন্যায় দেখিতেছে,—কল্য হয়ত তাহাকে আপন অপেক্ষাও অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবে?

বিহারী।—আপনি মানুষের ভ্রান্তির কথা বলিতেছেন? আমিও ত বলি যেখানে এত ভ্রান্তির সম্ভাবনা, সেখানে এত ব্যস্ততা কেন? গিরিবালার মত হইলে কোন্ মূর্খ আপত্তি করিত? আর যদি জানিতাম, গিরির মত না হওয়া পর্য্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করিবেন, তাহা হইলেও আমরা কিছু করা উচিত মনে করিতাম না। কিন্তু যখন জানিলাম, আপনারা একজনের মতের বিরুদ্ধে তাহাকে একজনের সহিত বাঁধিয়া দিতেছেন, তখন তাহাকে উদ্ধার না করা কাপুরুষের কার্য্য।

কৃপানাথ বাবু।—দুই আত্মা মিলিলেই ভালবাসা হয়।

বিহারী।—আপনি বিবাহ কাহাকে বলেন? আগে বিবাহ, তারপর ভালবাসা, না আগে ভালবাসা তারপর বিবাহ?

কৃপানাথ।—যাহার পক্ষে যেমন;—কাহার হয় ত বিবাহের পরে ভালবাসা হয়।

বিহারী।—সে বিবাহকে আপনি কি বলেন? সে বিবাহ কোন্ প্রণালী অনুসারে হয়?

কৃপানাথ।—বোধ করি আপনি জানেন, বাহ্য-সৌন্দর্য্যেই অধিক লোক আকৃষ্ট, সৌন্দর্য্যে ভুলিলে ভালবাসা হইবে না কেন?

বিহারী।—আপনি কেবল বাহিরের সৌন্দর্য্যকেই বিবাহের মূল মনে করেন!! একজন অপরের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইলেই যে দুই জন পরস্পর আকৃষ্ট হইবে, তাহার প্রমাণ কি?

কৃপানাথ।—একজন ভালবাসিলে অন্যে যেমন ভাল না বাসিয়া পারে না, সেই প্রকার একজন সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইলে অন্য তাহাতে আকৃষ্ট না হইয়া পারে না।

বিহারী।—আশ্চর্য্য তর্ক! মনে করুন একজন সুন্দর, একজন কুৎসিৎ; এমন স্থলে কুৎসিত ব্যক্তি অনায়াসেই অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে,

কিন্তু সুন্দর ব্যক্তি কুৎসিতের প্রতি আকৃষ্ট হইবে কেন ?

কৃপানাথ।—একজন রূপে কুৎসিত হইতে পারে, কিন্তু হয় সে অর্থে, নয় বিদ্যায়, নয় বুদ্ধিতে অপর অপেক্ষা অধিক সুন্দর। এই জগতে কোন না কোন বিষয়ে প্রত্যেক লোক অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বিহারী বলিলেন, তবে কি আপনি অর্থে, মানে, বিদ্যায় ও সৌন্দর্য্যে বিবাহ হওয়া উচিত মনে করেন ? ছি, ছি! এমন ঘৃণিত কথা মুখে আনিবেন না।

এই কথার পর চতুর্দ্দিকে মহা গোলযোগ আরম্ভ হইল। কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, বৃথা তর্কে প্রয়োজন কি,—তুমি এখন সম্মত হবে কি না, বল ?

বিহারী।—কোন্ কথায় সম্মত হব ?

দলের লোক।—গিরিবালাকে দিতে।

বিহারী।—প্রথমতঃ গিরিবালাকে দিতে আমি কেহই নই।—দ্বিতীয়তঃ গিরিকে কাহার হাতে দিবার কথা বলেন ?

দলের লোক। ব্রজনাথ বাবুর হাতে।

বিহারী।—ব্রজনাথ বাবু গিরির অভিভাবক স্থানীয় হইয়া যখন তাহাকে ভুলাইয়া আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখন তাহার হাতে আর গিরিকে দেওয়া যাইতে পারে না। গিরি জন্মদুঃখিনী,—বিধাতার ইচ্ছা হইলে সে চিরকাল দুঃখ পাইবে! আমরা দুর্নীতি এবং অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতে পারিব না। তা কখনই হবে না।

দলের লোক। ইহা কি অধর্ম্ম ?

বিহারী।—ইহার চেয়ে বিশ্বাস-ঘাতকের কার্য্য আর কি হইতে পারে ? আমরা কি ব্রজনাথ বাবুকে স্বামীরূপে বরণ করিবার জন্য তাহাদের বাড়ী গিরিবালাকে রাখিয়াছিলাম? না—শিক্ষা, ধর্ম্ম ও চরিত্র লাভের জন্য ? ব্রজনাথ বাবু এদেশের কুলাঙ্গার, তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে মহা কলঙ্ক আনিয়াছেন। আবার বলেন, ইহা কি অধর্ম্ম? গিরিবালা যদি অনাহারে প্রাণত্যাগ করে, তবুও সে পিতার ন্যায় অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করিবে না।

দলের লোক।—তুমি তাহা কি প্রকারে জান ?

বিহারী।—আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি।

দলের লোক।—তুমি কি অভ্রান্ত ?

বেহারী।—এ বিষয়ে আমি অভ্রান্ত।

দলের লোকগুলি "তবে থাক, ইহার সুখ পাবে," এই বলিয়া ব্রজনাথ ও কৃপানাথ বাবুকে লইয়া উঠিয়া আসিলেন।

দেশীয় ধর্ম্মসংস্কারকদিগের চরিত্র ভাবিতে ভাবিতে বিহারীলালের দুই চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুখিনীর সন্তান।

বিজয়গোবিন্দ গিরিবালাকে লইয়া মুঙ্গেরে পৌছিয়া বিষম ভাবনার মধ্যে পড়িলেন। বিহারীলাল যাঁহার নিকট পত্র দিয়াছিলেন, তাঁহার বাসা অনেক অনুসন্ধানের পর মিলিল, কিন্তু দেখিলেন, সে বাড়ীতে তালা বন্ধ রহিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তিন মাস হইল সে বাবু পাটনায় বদ্‌লি হইয়াছেন। বিজয়গোবিন্দ বিদেশে ভগ্নীকে লইয়া মহা ভাবনার মধ্যে পড়িলেন। কি করিবেন, কোথায় থাকিবেন, এই সকল ভাবনা তাঁহার অন্তরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। তিনি অগত্যা পাটনা যাইবেন স্থির করিয়া, যে পাল্কীতে ষ্টেসন হইতে ভগ্নীকে লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই পাল্কীতেই ট্রেনের সময় পর্য্যন্ত ভগ্নীকে রাখিলেন, তারপর দোকান হইতে আহারের উপযুক্ত কিছু আনিয়া উভয়ে আহার করিলেন। তখন ট্রেনের ৪।৫ ঘন্টা বাকী ছিল, এই সময় তাঁহারা রামপ্রসাদের ঘাটে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেখানে অনেক বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সকলেই আগ্রহ সহকারে বিজয়গোবিন্দকে নানা প্রকার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বিজয়-গোবিন্দ সকল দিক্ বজায় রাখিয়া সকলকেই সন্তোষজনক উত্তর দিলেন। ক্ষণকাল পরে সেখানে বিজয়ের মাতুল বাড়ীর একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বিজয়ের মাতুল লোকনাথ বাবু দুই বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন, তাহা বিজয়গোবিন্দ পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলেন। এই সময়ে মাতুল বাড়ীর লোক দেখিয়া তিনি চমকিত হইলেন, সবিস্ময়ে

বলিলেন ;—"আপনি এখানে কেন ? মামাবাড়ীর সকলে ভাল আছেন ত ?"

লোকটী বলিল, এই দুমাস হইল তোমার পিতাকে ল'য়ে আমরা এখানে আছি। গোস্বামী মহাশয় অত্যন্ত পীড়িত, দেশে থাক্‌তে তাঁহার আর বাঁচিবার আশা ছিল না, আজ কাল একটু ভাল আছেন। তুমি এখানে কবে কি জন্য এসেছ ?

বিজয়গোবিন্দ সকল কথা গোপন ক'রে বলিলেন, আমরা এই কতক্ষণ এসেছি ;—চলুন এখন বাসায় যাই।

লোকটী একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। দেশ হইতে গিরি-বালাকে আনয়নের পর বাড়ীর সহিত বিজয়ের সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। দেশে বিজয়ের নামে সকলেই বিরক্ত। বিজয়ের পিতা এই বৃদ্ধ বয়সে সমাজের ভয়ে অতি কষ্টে এক মাত্র পুত্রের মমতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, বিজয়ের পত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না, কিন্তু অন্তরে যেন দারুণ শেল বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। নানা মনোকষ্টে তাঁহার ঘোরতর পীড়া জন্মিয়াছে। বিজয়ের বৃদ্ধ জননী পুত্র কন্যাকে হারাইয়া সংসারকে আঁধারময় দেখিতেছেন ;—চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার রাত্রি প্রভাত হয়, আর চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার দিন কাটিয়া যায়। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বিজয়ের সহিত জাতি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, পুত্র কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া সমাজে থাকিতে তাঁহার একটুও সাধ ছিল না ; কিন্তু কি করেন,—বৃদ্ধ গোস্বামী মহাশয়ের মন-রক্ষার্থ সমাজে থাকিতে নিতান্ত বাধ্য,তিনি কোন প্রকারেই জীবনে অপযশের বোঝা লইতে সম্মত নহেন। কিছু দিন পরে যখন বিজয়ের পিতার পীড়া বাড়িয়া উঠিল, তখন তাঁহার শুশ্রূষাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইল। দিনান্তে জননী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেন , বিজয়, তোর মনে কি এই ছিল ! একবার আমাদের কষ্ট চ'ে ও দেখ্‌লিনে ?

বিজয়গোবিন্দের বাড়ীর অবস্থা তত ভাল নহে ; যত দিন মাতুল জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি এক প্রকারে এই পরিবারের ভরণ পোষণ করিতেন। মাতুলের ভরসা ছিল, বিজয়কে মানুষ করিতে পারিলে সকল কষ্ট নিবারণ হইবে। কিন্তু বিজয় যখন সে পথে কণ্টক রোপণ করিয়া চলিলেন, তখন মাতুল একেবারে নিরাশ হইলেন, বিজয়ের পিতা মাতা চারিদিক আঁধার দেখিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে যখন বিজয়ের মাতুলের মৃত্যু

হইল, তখন বিজয়ের পিতা মাতাকে বড়ই আর্থিক কষ্টে পড়িতে হইল। কোন প্রকারে যেন আর দিন গত হয় না। বাড়ীর জিনিস পত্র ক্রমে ক্রমে সকল বিক্রয় করা হইতে লাগিল। ক্রমে যখন বিজয়ের পিতার রোগ আরো বৃদ্ধি পাইল, তখন গরু বাছুর সমস্ত বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধ জনক জননী ডাক্তারের পরামর্শ মতে দেশ ছাড়িয়া চলিলেন। এই সময়ে বিজয়ের মামাতো ভাই অবিনাশচন্দ্রের একটী কর্ম্ম যুটিয়াছিল। তিনি পিশিমাতার এই কষ্টের সময় কতক টাকা ও এক জন লোক পাঠাইয়া দিলেন। সেই লোকের সহিত ইহারা দেশ ছাড়িয়া চলিলেন। বিজয়ের জননী মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন,—স্বামীর যদি মৃত্যু হয়, আমি তাহা হইলে জলে ডুবিয়া মরিব,—সুতরাং তিনি মনে মনে চিরকালের জন্য দেশত্যাগ করিয়া চলিলেন।

বিজয়গোবিন্দ সেই লোকটীকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বলিলেন, ভয় কি, চলুন। এই বলিয়া বেহারাদিগকে পাল্কী আনিতে বলিয়া সেই লোক-টীর সহিত চলিলেন। যথা সময়ে বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পিতার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে, কেবল অস্থি কয়েকখান অবশিষ্ট আছে। বিজয় ও গিরি আসিয়াছে শুনিয়া বৃদ্ধ জননী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, তিনি ছুটিয়া গিরি ও বিজয়ের নিকট আসিলেন, তাহার নয়ন হইতে জল পড়িতে লাগিল—বলিলেন—"বিজয়—এতদিন পরে তোর মাকে কি মনে পড়েছে? আয় বাপ একবার তোকে বক্ষে ধরে প্রাণ শীতল করি, আমার প্রাণ যে তোদের জন্য অস্থির ;—দ্যাখ্ আমি পোড়াকপালী আজও আছি।" এই বলিতে বলিতে বিজয়ের জননী বিজয়কে বক্ষে ধারণ করিলেন, বিজয়ের হৃদয় ভেদ করিয়া যেন কি অপূর্ব্ব স্নেহ মমতা আসিল,—বিজয় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, মা! আমি অপরাধী সন্তান,—আমাকে কি তোমার মনে আছে ?

জননী বলিলেন,—"বাপ, সংসারে তোরা ভিন্ন আমার আর কে আছে যে তোদিগকে ভুলিব? ধর্ম্মের জন্য তোরা আমাকে ভুলেছিস্, কিন্তু আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি যে তোদের সহিত লোপ পেয়েছে ;—আমার সকলি যে তোরা।" বিজয় ও গিরিবালার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল, ইহারা মনে মনে ভাবিলেন, তাহাদের জন্যেই পিতা মাতার জীবন এক প্রকার গত হইয়াছে, উভয়ে মিলয়া জননীকে শান্তনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, মা!

এই যে আমরা এলেম, আর কেঁদ না ; এই বলিয়া দুই জনে মিলিয়া বৃদ্ধ পিতার সেবায় রত হইলেন, এবং এই সংবাদ কলিকাতায় বিহারী-লালকে লিখিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রেম রমণীর একমাত্র সম্বল।

বিহারীলাল সংবাদ পাইয়া যথা সময়ে মুঙ্গেরে আগমন করিলেন। বিহারীর হাতে অধিক টাকা কড়ি ছিল না, যাহা কিছু ছিল তাহা লইয়াই আগমন করিলেন।

বিহারীলালের আগমনে বিজয়গোবিন্দ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, এই বিপদে তাহার হৃদয়ের বল যেন শত গুণে বৃদ্ধি পাইল। তিনি ও বিহারীলাল উভয়ে প্রাণপণ করিয়া বৃদ্ধ গঙ্গাগোবিন্দ গোস্বামীর সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

বিহারীলাল অতি শৈশব হইতে পিতৃমাতৃহীন, তিনি বিজয়ের পিতা ও মাতাকেই পিতা ও মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। বিজয়ের মা ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ;—এতদিনের পর তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত প্রসন্ন হইল। তিনি অল্পে অল্পে রমণী-সুলভ স্নেহগুণে বিহারীলালকে ভাল-বাসার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

এদিকে বিজয়ের পিতার জীবন-প্রদীপ যেন ক্রমেই নিবু নিবু হইয়া আসিল ;—কাল যেন মুখব্যাদান করিয়া বৃদ্ধকে গ্রাস করিতে উপস্থিত হইল।

গিরিবালার মনের অবস্থা কিরূপ, তিনি কি ভাবে রহিয়াছেন ? তিনি হৃদয়ে গোপনে একটী বাসনাকে পোষণ করিয়া দিন রাত্রি তাহার পূজা করি-তেছেন। পৃথিবীতে গিরিবালার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কেহই সে বাসনা কি, তাহা এপর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। কলিকাতা হইতে আসিয়াও গিরিবালার হৃদয় যেন শান্তি পায় নাই,—ইহা কয়েকদিন পরে সূক্ষ্মদর্শী বিহারীলাল বুঝিতে পারিলেন ; কিন্তু কি জন্য এপ্রকার হইতেছে, তাহা না জানিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি বিজয়ের অজ্ঞাতসারে গিরিবালার মন-পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলেন।

পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিহারী গিরিবালার মন বুঝিতে পারিলেন ;—এতদিন পর্য্যন্ত যে সস্নেহ দৃষ্টিকে সরল ভালবাসা জ্ঞানে তুচ্ছ মনে করিয়াছেন, দেখিলেন, সেই দৃষ্টি প্রগাঢ় প্রেমপূর্ণ। দেখিলেন,—গিরিবালা দিন রাত্রি অজ্ঞাতসারে একটী মুখ-ছবির প্রতি অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকেন, আর তাঁহার দুনয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে থাকে। দেখিলেন,—গিরিবালার হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস বহির্গত হইয়া একটী জীবকে মোহিত করিতে ধাবমান,—বুঝিলেন, গিরিবালা বিমুগ্ধ হরিণীর ন্যায় উন্মত্তা হইয়া, যাহা অসম্ভব, তাহা সম্ভব করিবার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। বিহারীলাল সকলি বুঝিতে পারিলেন ; বুঝিতে পারিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন।

যাহা হউক, বিহারী গিরিবালার মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু সে চেষ্টাতে মনের আগুণ ঘৃতাহুতির ন্যায় আরো প্রজ্জ্বলিত করিল। বিহারী বুঝিলেন, কৃপানাথ বাবুদিগের সংসর্গে থাকিয়া গিরিবালা মানবের সর্ব্বনাশের মূল যাহা, তাহাই শিক্ষা করিয়াছে ; বুঝিলেন, এই শিক্ষায় গিরিবালার পরিণাম অত্যন্ত জটিল হইবে ; বুঝিলেন, এই বিষে গিরির সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। বুঝিলেন, গিরি আত্মীয়তার বাদ বিচার পর্য্যন্ত গণনায় আনিতেছেন না ! কি সর্ব্বনাশ ! ! !

এদিকে বিজয়ের পিতা কয়েক দিন পরেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। যে আত্মা মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সংসারের চিন্তায় আকুল ছিল, যে হৃদয় এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে পুত্র কন্যার ভালবাসাকেই জীবনের সুখের নিদান বলিয়া তাহাতেই শান্তি পাইতেছিল, সেই আত্মা নিমেষ মধ্যে মৃত্তিকার শরীর মৃত্তিকায় ফেলিয়া চলিয়া গেল,—সেই হৃদয় যেন অনন্তকালের জন্য পুত্রকন্যার মুখ-ছবি ভুলিয়া কোথায় লুক্কায়িত হইল ! বিধাতার লীলা বিধাতা নিমেষ মধ্যে ভাঙ্গিলেন। পিতার মৃত্যুতে বিজয়ের মস্তকে সম্পূর্ণরূপে সংসারের চিন্তা পতিত হইল। সংসারে আর কে আছে ? একমাত্র বৃদ্ধা জননী বিজয়কে যষ্টিস্বরূপ অবলম্বন করিলেন। বিজয়গোবিন্দ পিতার মৃত্যুর পর ঘোরতর ভাবনার মধ্যে পড়িলেন। বিহারীলাল এই সময়ে বিজয়ের জীবনের অনেক উপকার করিলেন, তিনি বলিলেন,—"বিজয়, কেন ভাবনায় আকুল হও ? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তোমার জন্য পৃথিবীতে অন্নের সংস্থান করিয়াছেন। পৃথিবীতে কেহই অনাহারে মরি-

বার জন্য জন্ম গ্রহণ করে নাই;—মানুষ মানুষের অনিষ্ট করিতে যতই চেষ্টিত হউক না কেন,—মানুষ দ্বেষ হিংসা বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষের বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, একদিনের তরেও মানুষের দিন অনাহারে যায় না। তুমি কি জন্য কাতর হইতেছ? কৃপানাথ বাবু ও ব্রজনাথ বাবু আমাদিগের অনেকটা আশা ভরসার স্থল ছিলেন। আজ তাঁহারা আমাদিগের অনিষ্ট চিন্তায় রত। কিন্তু মনে ভাবিও না, তাঁহাদের দুরভিসন্ধি কখনও পূর্ণ হইবে। এ সংসারে যাঁহার অন্তর সাধু ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত, তাঁহার সহায় ঈশ্বর। আমি কতবার ডুবিয়াও দেখ ঠিক রহিয়াছি;—কৃপানাথ বাবু চক্রান্ত করিয়া আমার হস্ত হইতে সভার কার্য্যটী লইলেন;—আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইতেছেন; কিন্তু তিনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, তিনি আমাদের কি করিবেন? সংসারে মনুষ্যের মুখ-ছবি নিরীক্ষণ করিয়া সুখ পাইতে কখনও বাসনা করি নাই, সুতরাং তাহাতে কষ্ট কি? সকল বিপদ ও ভাবনার মধ্যে এক মাত্র হৃদয়ের দেবতাকে স্মরণ করিয়া চলিতে পারিলে কাহারও ভয় নাই। নিশ্চয় জানিও, যে আজ অসহায় হইয়া অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছে, অবশ্য একদিন সে কূল পাইবে; আজ যে সংসার বিপত্তির মধ্যে পড়িয়া কেবল হাহাকার করিতেছে, অবশ্য তাহার মুখ আমার প্রসন্ন হইবে;—চক্ষের জল আবার অন্তর্হিত হইবে।"

এই সকল কথা শুনিয়া বিজয়গোবিন্দ অত্যন্ত শান্ত্বনা লাভ করিলেন। কিন্তু হাতের টাকা কড়ি সমস্ত নিঃশেষিত হওয়ায় অত্যন্ত কষ্টে দিন যাইতে লাগিল। মুঙ্গেরে অল্প দিনের মধ্যে যে সকল লোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহারা এই কষ্টের সময় সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কাহারও দ্বারা কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য হইল না। বিহারীর নিকট যে কিছু ছিল, তাহাও যখন ফুরাইয়া আসিল, তখন আর মুঙ্গেরে থাকা উচিত মনে করিলেন না। তাঁহারা যথা সময়ে কলিকাতায় পৌঁছিলেন। কলিকাতা আসিয়া দেখিলেন, কৃপানাথ বাবু ও ব্রজনাথ বাবু সাধ্যানুসারে বিহারীর অপযশ ঘোষণা করিয়া সকলকে চটাইয়া দিয়াছেন। সমাজে কৃপানাথ বাবুর বিশেষ আধিপত্য, বিহারী দেখিলেন, তাঁহার পূর্ব্বের আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ আর পূর্ব্বের ন্যায় মন খুলিয়া বিহারীর সহিত তেমন আলাপ

করে না,—বিহারীর অসাক্ষাতে সকলেই নানা প্রকার নিন্দাবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়ায়,—যদি হঠাৎ কোন সময়ে নিন্দা করিবার স্থলে বিহারী উপস্থিত হন, অমনি সকলে নীরব ভাব ধারণ করে। সম্মুখে কেহই কোন প্রকার নিন্দা করে না, অথচ অসাক্ষাতে সকলেই নিন্দা করে, ইহা কেমন ভাব ! সম্মুখে কেহই কোন কথা বলিতে সাহস করে না, অথচ অসাক্ষাতে অনেকেই নানা প্রকার কুৎসা ঘোষণা করিয়া বেড়ায়, এ প্রথা ব্রাহ্ম সমাজেও প্রবেশ করিয়াছে বুঝিতে পারাতে বিহারীর অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। যে ব্যক্তি সম্মুখে একজনের দোষ বলিতে পারে না,অথচ অসাক্ষাতে নিন্দা করে, তাহার ন্যায় কাপুরুষ ব্রহ্মাণ্ডে অতি বিরল। বিহারী এ যাত্রা কিছু কাল কলিকাতায় বাস করিয়াই বুঝিলেন, ব্রাহ্মসমাজ এই প্রকার কাপুরুষের দ্বারা এক প্রকার পূর্ণ হইয়াছে। একদিন সহসা একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সে বলিল, বিহারী বাবু, যেখানে যাই, সেইখানেই আপনার নিন্দা শ্রবণ করি, আপনি এ সম্বন্ধে কেন কথা বলেন না ?

বিহারী গম্ভীরভাবে বলিলেন,—আমার সম্মুখে যে সকল কাপুরুষ কোন কথা বলিতে সাহসী নহে,অসাক্ষাতে কেবল নিন্দা করে,তাহাদিগের নিন্দাবাদে আমি কেন প্রতিবাদ করিব ? জগৎ সংসার জানে, নিন্দুকের ন্যায় অপকৃষ্ট জীব সংসারে অতি বিরল। যদি আমার প্রকৃত পক্ষে কোন দোষ থাকে, তবে তাহা সম্মুখে বলিলে বন্ধুর ন্যায় কাজ করা হয়, কেন না, প্রকৃত পক্ষে আমি দোষী হইলে আমার দোষ সংশোধন করিতে পারি, যদি দোষ না থাকে, তবে নিন্দুকের ভ্রম দূর হয়। এ প্রকার না করিয়া যাহারা অসাক্ষাতে দোষ ঘোষণা করে, তাহারা আমার কৃপার পাত্র, তাহাদিগের দুশ্চরিত্রের জন্য নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিতে ইচ্ছা করে। বিধাতার নিকট তাঁদের জন্য প্রার্থনা করা ভিন্ন ইহার প্রতিকারের আর উপায় নাই।

লোকটী বলিল, ইহাতে আপনার যে অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না ?

বিহারী।—এ সংসারের ইষ্টানিষ্ট কি, বুঝি না। আমার লক্ষ্য একমাত্র ঈশ্বর, তাঁহাকে জীবনে কখনও পরিত্যাগ না করি, ইহাই একমাত্র কামনা ; সংসারের অপবাদ, নিন্দা প্রভৃতিতে আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। কেবল সমাজ যদি আমার লক্ষ্য হইত,তবে আমার দুঃখের সীমা থাকিত না ; কিন্তু সমাজ আমার নহে। আমি নিন্দুকের নিন্দাবাদে ভীত বা কাতর নহি।

এই প্রকার তেজের সহিত বিহারী সমাজের অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার অম্লানচিত্তে সহ্য করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিনিময়।

ঈশান মণ্ডল যথা সময়ে ভবানীকান্তের চক্রান্ত উত্তম রূপে বুঝিতে পারিল;—দুঃখী প্রজা ঈশান ক্ষমতাশালী জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আর কতদিন টিকিয়া থাকিবে? ঈশান কিয়দ্দিবস পরে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া এক খানি মুদি দোকান খুলিল;—সেই দোকানের আয়ে ঈশানের অতি কষ্টে দিন কাটিতে লাগিল।

ঈশানের মুদি দোকান কেবল লক্ষ্য ছিল না। সে কোন সূত্রে জানিতে পারিয়াছিল, চিন্তামণি কলিকাতায় আসিয়াছে। তাহার অনুসন্ধান করাই ঈশানের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু মূর্খ ঈশান কোথায় চিন্তামণির অনুসন্ধান করিতে লাগিল? ঈশান শুনিয়াছিল, কালীঘাট বাঙ্গালপাড়ায় পূর্ব্ব বাঙ্গালার সমস্ত লোক থাকে, ঈশান সমস্ত দিবস দোকান করিয়া রাত্রে সেইখানে যাইয়া চিন্তামণির অনুসন্ধান করিত, কিন্তু কোন রকমেই চিন্তামণির সংবাদ পাইল না। এই প্রকারে অনেক দিন গত হইল; ক্রমে ক্রমে চিন্তামণির মমতা ভুলিয়া যাইতে লাগিল। এ জন্মে আর যাহাকে পাইবার আশা নাই;—তাহার জন্য কে চিরকাল কষ্ট সহ্য করিবে? ৫।৬ বৎসর পরে ঈশান মনে করিল, এ জন্মে আর চিন্তামণির সহিত দেখা হইবে না। এই সময়ের পর আর ঈশান চিন্তামণির জন্য কোন প্রকার অনুসন্ধানই করে নাই।

দশ বৎসর পরে ঈশান এক দিন অপরাহ্নে দোকানে বসিয়া রহিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ দোকানে একটী লোক প্রবেশ করিল সে লোকটী ঈশানকে রাস্তা হইতে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছে, কিন্তু ঈশান এখনও লোকটীকে চিনিতে পারিতেছে না;—লোকটী ভিখারী বিহারী। বিহারী দোকানে উঠিয়া বলিল, আমি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি, আর তুমি আমাকে

চিনিতে পারিতেছ না? সেই বিপদগ্রস্ত যুবক দুটীর কথা মনে কর,—আমি তাহারই একজন; আমার নাম বিহারীলাল।

ঈশান একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, আপনার এ বেশ কেন? এইরূপ বেশের জন্যই আপনাকে চিনিতে পারি নাই, যাহা হউক, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি কত দিন এখানে আসিয়াছেন?

বিহারী বলিলেন;—অনেক দিন। তুমি চিন্তামণির কোন সংবাদ জান?

ঈশান।—কিছুই জানি না; আপনি বলিতে পারেন?

বিহারী বলিলেন, আমি যাহা জানি তাহা পরে বলিব; তুমি চিন্তামণিকে কোথায় কি ভাবে পাইয়াছিলে, আমাকে আগে বল।

নিজ জীবনের কাহিনী বলিতেই ঈশানের অনেক সময় গেল; তার পর সংক্ষেপে চিন্তামণির বিবরণ বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চিন্তামণি এখন কোথায় আছে, আমাকে বলুন, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে; আপনি বলুন, আমি জন্মের মত তাহাকে একবার দেখিয়া সুস্থির হই।

বিহারী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার দুনয়ন হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল, বলিলেন;—ঈশান, আমি চিন্তামণির জীবনকে ঘোরতর কালিমার রেখা দ্বারা মলিন করিয়াছি; চিন্তামণি এখন জীবিত থাকিয়াও যেন নাই।

ঈশান বিহারীলালের ভাব দেখিয়াই অত্যন্ত বিপদের আশঙ্কা করিল, এবং সে বিপদ স্মরণে বিহারী বাবুর অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, বুঝিতে পারিয়া বলিল, আপনার সহিত যে বাবুটী পীড়িত অবস্থায় আমাদের বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন, তিনি কোথায়?

বিহারী হৃদয়ের ভাব সংবরণ করিয়া বলিলেন, তিনি এখন দেশের এক জন বড় লোক হইয়াছেন।

ঈশান বলিল;—তাঁহাকে দেখিতে এক বার ইচ্ছা হয়, আপনি বলেন ত তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাত করিতে যাইব।

বিহারী।—তোমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার অবকাশ হইবে কি না, সন্দেহ, তুমি সামান্য দীন দুঃখী; তিনি এক জন বড় লোক।

ঈশান তারপর বিহারীলালের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় সকল তন্ন তন্ন

করিয়া জিজ্ঞাসা করিল। বিহারীলাল সরল মনে ঈশানের সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন, কিন্তু কি কারণে ভিখারীর বেশ ধারণ করিয়াছেন, তাহা বলিলেন না।

এই দিন হইতে বিহারীলাল দুঃখী ঈশানকে একটী আত্মীয় জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিলেন। বিহারী এক হিসাবে অনেক বিষয়ে সংসারের উচ্চ জীব হইয়াও সামান্য লোকের প্রণয়ের ভিখারী হইলেন; বিহারীর জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, মন, হৃদয় সকলি ঈশানের প্রেমের নিকট বিক্রয় করিলেন। বিক্রয় করিয়া পাইলেন কি? সংসারের সর্ব্বপ্রকার অভাব-ক্লীষ্ট একটী মলিন হৃদয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কাহার জন্য জীবন ধারণ?

একজন সামান্য ইতর লোকের সহিত বিহারীলালের ভালবাসা যতই ঘনীভূত হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক হইতে বিহারীলালের মস্তকে ততই অপযশ স্তুপাকার হইতে লাগিল। পাপীর সহিত আত্মীয়তা, পাপীর সহিত ভালবাসা, দরিদ্রের সহিত বন্ধুত্ব, ধার্ম্মিকদিগের চক্ষে ইহা বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল।

বিহারীকে পূর্ব্বে লোকেরা যে সকল বিষয় উল্লেখ করিয়া নিন্দা করিত, এই সময়ে সে সকলি ঢাকা পড়িল;—পাপীর সহিত আত্মীয়তা, ইহাই বিহারীকে নিন্দা করিবার একটী প্রধান যন্ত্র হইল।

এই সময়ে কলিকাতার ব্রাহ্ম সমাজে পাপী ও পুণ্যাত্মার সহিত সম্বন্ধ লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছিল। যে পাপী,—তাহাকে দেখিলে, তাহাকে স্পর্শ করিলে, তাহার কথা শুনিলে, সে যে বস্তু স্পর্শ করে, তাহাতে হাত দিলে পুণ্যাত্মা ঘোরতর পাপ কার্য্যে লিপ্ত হন, এই উদারনীতি সমাজের আভ্যন্তরীণ মলিনতাকে উজ্জ্বল করিতেছিল। মানুষ মানুষের পাপের দণ্ডদাতা, মানুষ মানুষের সৎকার্য্যের পুরস্কার-বিধাতা এতদ্ভিন্ন উচ্চ আদর্শ আর কি আছে? এই সকল মত অনেকের মনে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। বিহারী জানিতেন, ঈশান পাপী,—কিন্তু এ সংসারে পাপ ছাড়া মানুষ

কোথায় ? ঈশান পাপী,—কিন্তু ঈশানের হৃদয়ে এমন কতকগুলি মহত্ত্ব আছে, যাহা সংসারে অতি বিরল। ঈশান পাপী,—বিহারী জানিতেন, তিনিও পাপী,—সংসারের সকলেই পাপী—পাপী ভিন্ন সংসারের লোকের অস্তিত্ব নাই। বিহারী ভাবিলেন, পাপী যদি পাপীকে ভালবাসিতে না পারিল,—পাপী যদি পাপীর দুঃখে দুঃখী হইতে না পারিল, তাহা হইলে একমাত্র পুণ্যের প্রস্রবণ ঈশ্বর পাপীকে ভালবাসিবেন, ইহা আমরা কি প্রকারে বিশ্বাস করি ? অন্যদিকে ঈশ্বর যাহাকে পরিত্যাগ করেন না,—ঈশ্বর যে পাপীকে ভালবাসিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিরত নহেন, আমি কোন্ কারণে সে পাপীকে ঘৃণা করিব ? আমি যদি পাপীকে ভাল না বাসি, তবে অন্য পাপীও আমাকে ভালবাসিবে না। সংসারময় পাপী, নারকী ; তবে কি এ সংসারে কাহাকেও কেহ ভালবাসিবে না ? বিহারী বুঝিলেন, এ অতি কঠিন সমস্যা।

আবার ভাবিলেন, আমি যদি আমার চক্ষে পুণ্যাত্মাও হই, তবু পাপীকে আমার ঘৃণা করা, ভাল না বাসিয়া থাকা উচিত নহে। ঈশ্বরের নিকট আমি ঘোরতর অপরাধী, ঘোরতর পাপী, আমি যদি ঈশ্বরের নিকট তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতে পারি, এবং তিনি যদি আমাকেও সমান ভাবে করুণা বিতরণ করেন, তবে আমার ন্যায় পাপী কেনই বা আমার নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা না করিবে ? এবং আমিই বা কেন তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিব ? পাপীকে ঘৃণা করিতে মানবের কি অধিকার ? তবে আমি ডুবিয়া যাই—তবে আমি মরি—তবে ঈশ্বরের বিশ্বপ্রেম বিস্মৃত হই,—তবে পতিত-পাবন নাম ভুলিয়া যাই,—প্রার্থনার উপকারিতা বিস্মৃত হই। মানুষকে ক্ষমা করিতে না পারিলে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারি না ; আমি পাপী, যদি ঈশ্বরের নিকট ক্ষমার অধিকারীই না হই, তবে আমি মরিয়াছি ;—চির জীবনের তরে মরিয়াছি। বিহারী মানব সমাজের একদেশদর্শী শাসন-প্রণালীর উপকারিতা বুঝিতে পারিতেন না। অন্য দিকে পাপীর কথা স্মরণ হইলে তাহাদের জন্য কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা হইত। পাপীকে ভালবাসাই তাহার সংশোধনের একমাত্র উপায়, একমাত্র অমোঘ ঔষধ, পাপীকে পরিত্যাগ করা কিম্বা কঠোর শাসন করাই তাহার সর্ব্বনাশের মূল, ইহা বিহারীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি জীবনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি পাপীকে ভাল-

যাহার দ্বারা বশ করিয়া তাহাকে সংশোধন করিতে না পারি, তবে তাহাকে শাসন করিয়া কখনও সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব না? এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি পাপীদিগকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন। এই ভালবাসার বলে,—এই ঔষধে তিনি জীবনে অনেক মলিন আত্মাকে সংশোধন করিয়াছেন, এবং আজও করিতেছেন। কিন্তু এ চিত্র, এ ভালবাসার ভাব সংসারী ধার্ম্মিকদিগের অসহ্য, ইহা বিহারী অনেক দিন বুঝিয়াছেন। বুঝিয়াই ভিখারী হইয়াছেন। সকল আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যকে ভালবাসিব, মনুষ্যের জন্য জীবন দিব, ইহাই বিহারীর সকল শিক্ষার সারশিক্ষা। বিহারী একাজ করেন সেকাজ করেন, সব যেন সমাজের লোকদিগের সহ্য হইয়াছে;—তাহারা আর সব ভুলিতে পারিয়াছে, কিন্তু বিহারী পাপীকে ভালবাসে, ইহাই আর সহ্য হইতেছে না!! অহো মনুষ্য! তোমার হৃদয় কি দুর্ব্বল! তুমি সব সহ্য করিতে পার,—কিন্তু নিজে পাপে তাপে জর্জ্জরিত হইয়াও পাপীকে ভালবাসিতে পার না! ধিক তোমার শিক্ষাকে, ধিক তোমার মনুষ্যত্বে, ধিক তোমার ধর্ম্মজ্ঞানে!!

বিহারীলাল লোকের কথাকে তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া চলিতেন। যাঁহারা সুখ দুঃখের বা পাপ পুণ্যের ভাগী নহে,তাহাদিগের ভালবাসার আকর্ষণে ভুলিয়া সাধু ইচ্ছার মূলে আঘাত করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য; যাঁহারা এ প্রকার মনুষ্যের মুখচ্ছবিকে ভুলিতে পারেন না, এ সংসারে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা নিতান্ত অপদার্থ জীবে পরিগণিত হন। বিহারীলাল মনুষ্যের মুখ তাকাইয়া চলাকে অত্যন্ত জঘন্য কার্য্য বলিয়া জানিতেন; তিনি আপন জীবনে এই সার-সত্য সকল প্রতিপালন করিতে যত্নশীল হইলেন। তিনি সমাজ-বাসের অযোগ্য লোক, চতুর্দ্দিক হইতে এই নিন্দার রোল গগন ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল।

ঈশানের জীবন যে সকল পাপ-চিন্তারূপ অপকৃষ্ট আভরণ দ্বারা মলিন হইতেছিল, বিহারীর ভালভাসার গুণে ক্রমে ক্রমে সে সকল তিরোহিত হইতে লাগিল; ঈশানের জীবন দিন দিন উন্নতির পথে ধাবমান হইতে লাগিল।

বিহারীলালের জীবনের সকল অংশ অন্ধকারযুক্ত হইয়া আসিয়াছে জীবনের কর্ত্তব্যপালনে নৈরাশ হইয়া তিনি সকল আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তবে একটী আশা ছিল, যাহাতে তাঁহার অস্তিত্ব আজও প্রতিষ্টিত,

রহিয়াছে। সেটী কি? পাপী ও জঘন্য মলিন আত্মাকে ভালবাসার দ্বারা বশ করা। চিন্তামণির সহিত তাহার জীবনের সকল আশা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। চিন্তামণির জন্য জীবনের এক চতুর্থাংশ সময় ব্যয় করিয়াও তাহার মঙ্গল সাধন করিতে পারিলেন না, ইহা তাঁহার হৃদয়ে শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইয়াছে। অন্য লোক চিন্তামণির স্বভাবে কলঙ্ক আরোপ করিয়া যাহাই বলুক না কেন, বিহারীলাল ঐ কলঙ্করাশির উন্নতির জন্যই জীবনের সকল সুখকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। চিন্তামণি পূর্ব্বে যাহাই মনে করুন না কেন, বর্ত্তমান সময়ে বিহারীলাল ভিন্ন পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় উপকারী বন্ধুর অস্তিত্ব জানিতেন না। বিহারীরও জীবনের একমাত্র কামনা,—চিন্তামণির উন্নতি। যখন সেই উন্নতির পথ রুদ্ধ হইল, তখন বিহারী সব পরিত্যাগ করিলেন। মানব চরিত্রে ইহা দুর্ব্বলতার লক্ষণ, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু বিহারী সকল বুঝিয়া শুনিয়াও, অবোধ ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। বিহারীর সকল সুখের আশা গিয়াছে; মাত্র একটী আশা আছে,—জীবনকে পাপীর জন্য উৎসর্গ করা। চিন্তামণি কোথায়, কি ভাবে রহিয়াছেন, তাঁহার জীবনে কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, এ সকলই পাঠকগণের জানিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতেছি, চিন্তামণির জীবনের শেষ ভাগের অবস্থা পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে বিবৃত হইবে।

আজ বিহারীলালের মূর্ত্তি মলিন হইয়াছে; হাতে একখানি পত্র, সেই পত্র খানি বিহারী পাঠ করিতেছেন, আর শরীর দুঃখ, ক্ষোভ, আত্মগ্লানি ও ক্রোধে পূর্ণ হইতেছে। পত্র খানি এই,—

বিহারী বাবু,

আজ তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব? যাহা বলিয়া ডাকিলে প্রাণ শীতল হয়, মন শান্তি পায়, হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, অভিধানের মধ্যে সে কথা নাই। আমি কাহার ছিলাম, কাহার হইয়াছি, কাহার হইব, একথা ভাবিতে বসিলে আমি যেন অগাধ সলিলে ভাসিতে থাকি। আমি আজ কারা-বন্দিনী, কেবল আজ কেন, আজন্ম সুখ-শূন্য, হৃদয়-শূন্য, পাপ-জর্জ্জরিত। তুমি আমাকে পত্র লিখিয়াছ,—ইহাই জীবনের সুখ;—নচেৎ আর কি সুখ আছে!! আমি যাহার হইয়াছি,—তিনি আমার হউন, তুমি জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছ! সুখের কথা। তুমি যদি লিখিতে ঈশ্বরের নিকট তুমি আমার মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করিতেছ, তাহা হইলে আরো সুখের

হইত। আমার আর এক মুহূর্ত্ত বাঁচিয়া থাকিতে অভিলাষ নাই। আমি মরিব, তুমিও মরিবে, কিন্তু দূরের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয় না কেন, বলিতে পার? আমার জীবনে আর কি সুখ আছে,—সুখের আশাই বা কি আছে? আর কি তোমাকে দেখিতে পাইব? আর কি তোমার সেই গম্ভীর শান্ত মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিব,—আর কি তোমার অমৃতময় উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিব? কোন আশা নাই, কোন ভরসা নাই। আমি ডুবিয়াছি,—অগাধ পাপ-সলিলে ডুবিয়াছি। গিরিবালাও জন্মদুখিনী,—হায় প্রাণের গিরির জীবনেও এত কষ্ট ছিল! গিরিকে তোমরা উদ্ধার করিয়াছ, শুনিয়া আমি সুখী হইলাম না,—এই চক্রান্তপূর্ণ জগতে মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই। তোমরা যাহা ভাল বুঝিতেছ, আমি তাহাতেও ঘোরতর বিপদের আশঙ্কা করিতেছি। ব্রজনাথ বাবু, আর ঐ কৃপানাথ বাবু নিতান্ত সামান্য জীব নহেন,—বুদ্ধিতে, বিদ্যাতে, জ্ঞানেতে ইঁহারা যেমন প্রবীণ, চক্রান্তে ও কৌশলে ইঁহারা তদপেক্ষা আরো প্রবীণ। তোমরা গিরির জন্য দিন রাত্রি চিন্তা কর;—মুঙ্গের হইতে গিরিকে সত্বর অন্য স্থানে প্রেরণ কর।

আর একটী কথা, তুমি সভার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভিখারীর বেশ ধারণ করিয়াছ;—ইহাতে আজ আমার মনে কত কথা উথলিয়া উঠিতেছে। আমি দেখিতেছি, তুমি সম্পদের অধিকারী হইয়াও কাঙ্গাল হইতে চলিয়াছ, তুমি সুখ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও দুঃখকে জীবনের সার জ্ঞান করিতেছে। তোমার জীবনের এ সকল লীলার গূঢ় তাৎপর্য্য আমি বুঝিতে পারিতেছি; বুঝিতে পারিয়া অন্তরের জ্বালায় অহরহঃ পুড়িয়া মরিতেছি! আমার যাহা হইয়াছে, তাহা ত হইল, তোমার জীবনও সুখের হইল না, ইহাই জীবনে দুঃখ রহিল।

ইতিমধ্যে আমি গিরিবালার এক খানি পত্র পাইয়াছি। প্রাণের গিরি আমার নিকট একটী ভিক্ষা চাহিয়াছে। লিখিয়াছে—"তোমার হৃদয়ের রত্নটী আমাকে দেও।" অবোধ বালিকা সংসারের কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না।—আমার রত্ন যে এখন আমার নয়, ইহা গিরি জানিয়াও জানে না; জানিয়াও জানে না, আমি যদি রত্নের অধিকারিনীই হইব, তবে আর দিন রাত্রি বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিব কেন? গিরি একটী স্বর্গীয় চিত্র—পাপের অস্পৃশ্য—সংসারের কালিমার অস্পৃশ্য!! গিরি সংসারে যাহা চায়, তাহাও যদি তাহার ভাগ্যে ঘটিত, তবুও আমি সুখী হইতে পারিতাম। জীবনে আর কোন সুখ নাই,—তোমাকে সুখী দেখিতে

পারিলেই একমাত্র সুখী হইব। বিহারি! তুমি কিসের জন্য ভিখারী হইয়াছ, তুমি অত্যন্ত নির্ব্বোধ;—তুমি মূর্খ। সামান্য বালুকণা হইতে বঞ্চিত হইয়াছ বলিয়া ভিখারী হইয়াছ? চাহিয়া দেখ, ঐ রত্নপূর্ণ ভাণ্ডার তোমার;—ঐ সুখ-শয্যা তোমার;-ঐ গিরি তোমার!! পাপে মলিন, সংসারের অতি ঘৃণিত, নিন্দিত, ধর্ম্মের অস্পৃশ্য দীনার জন্য তুমি কাতর কেন? না—আমার ভুল হইয়াছে। তুমি এক দিন আমাকে বলিয়াছিলে, তুমি আমার হইবে না। তুমি এক দিন আমাকে বলিয়াছিলে "তোমাকে আর ভালবাসিব না,- কারণ তোমাকে ভালবাসিলে সমাজের কঠোর শাসন সহ্য করিতে হইবে।" তারপর তোমার মুখে আরো কত মিষ্ট কথা শুনিয়াছি, কিন্তু আমার হৃদয় হইতে ঐ নিদারুণ কথা অন্তর্হিত করিতে পারি নাই;-শয়নে, স্বপনে তোমার ঐ কথা স্মরণ করিয়াছি। বস্তুতঃও তাহাই ঘটিয়াছে—ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন;—তোমার সমাজ লইয়া তুমি পরম সুখে আছ! না—সেও আমার ভুল। তুমি সকল পরিত্যাগ করিয়াছ! তুমি ভিখারী হইয়াছ। তবুও আমি জীবিত আছি! তুমি সংসারের একটী উজ্জ্বল রত্ন, পাপ ও কলঙ্ক শূন্য,—ধার্ম্মিক—জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান, জ্ঞানী। আমি দীন দুঃখিনী, সংসারের পাপ-কলুষিত আত্মাও জঘন্য হৃদয় বহন করিতেছি। তুমি আমার মমতা পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইতে চেষ্টা কর, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

তোমার আজন্ম দুঃখিনী—চিন্তামণি।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

বিহারীলাল বিজয়গোবিন্দের জন্য যে স্থানে একটী কর্ম্মের যোগাড় করিতেছিলেন, সে স্থান হইতে সংবাদ আসিল যে, বিজয়গোবিন্দ বাবু ইচ্ছা করিলে ৭০ টাকার একটী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন। বিহারীলাল এই সংবাদ পাইয়াই টেলিগ্রামে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, এবং দুই দিবসের মধ্যে বিজয়গোবিন্দ কর্ম্ম স্থানে যাইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। বিহারীলাল অনতিবিলম্বে বিজয়গোবিন্দকে কর্ম্মস্থান দক্ষিণ-সাবাজপুর নামক স্থানে পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু গিরিবালাকে ও বিজ-

য়ের মাতাকে কোথায় রাখা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে বড়ই অসুবিধা উপস্থিত হইল। সংস্কারকদলের সংশ্লিষ্ট বাসায় ইহাদিগকে রাখিতে বিহারীলাল কিম্বা বিজয়গোবিন্দ, কাহারও আর প্রবৃত্তি নাই, অথচ আর স্থানই বা কোথায়? বিহারী এবং বিজয় উভয়ই হিন্দুসমাজ হইতে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন, বিশেষতঃ গিরিবালা একেবারে বিচ্ছিন্ন। গিরিকে কোন হিন্দু আত্মীয়ের বাসায় রাখিতেও বিহারীলালের ইচ্ছা হইল না। অথচ বিহারী লাল আপন বাসাতেও রাখিতে পারেন না। বিহারীলাল একে অতিবাহিত, তাহাতে গিরিবালার মত অজ্ঞাতসারে দিন দিন তাহার দিকে ধাবিত হইতেছে, ইহা জানিয়া কোন ভরসায় বিহারীলাল আপন বাসায় ইহাদিগকে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন? চিন্তামণি যাহাই বলুন না কেন, বিহারী লাল আর বিবাহ করিবেন না, ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এমন স্থলে গিরির মনে বৃথা বাসনাকে পরিপোষিত হইতে দিতে বিহারী নিতান্ত অনিচ্ছুক। বিজয়গোবিন্দ আর কখনও এত দূরদেশে গমন করেন নাই, তিনি সহসা গিরিবালাকে ও জননীকে কর্ম্ম স্থানে লইয়া যাইতে সম্মত হইতেছেন না। এই সকল বিষয় লইয়া ক্রমে দুই দিবস অতিবাহিত হইল, কিন্তু কিছুই ধার্য্য হইল না। অবশেষে বিজয়গোবিন্দ মাতার মত জানিবার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"মা, তুমি কি আমার সহিত যাবে।"

বিজয়ের মাতা একথা শুনিয়া একটু চমকিত হইয়া বলিলেন;—তোমার সহিত যাব না তবে কোথায় থাক্‌ব? আমি প্রাণান্তেও আর তোমাকে ছেড়ে থাক্‌ব না।

এই কথার পর সকল গোলই চুকিয়া গেল, বৃদ্ধ মাতার মনে আর শেল বিদ্ধ করিয়া কষ্ট দিতে বিজয়ের ইচ্ছা নাই, কর্ম্মস্থান যতই বিভীষিকা-পূর্ণ হউক না কেন, বিজয়গোবিন্দ গিরিবালা ও জননীকে লইয়া যথা সময়ে কর্ম্ম স্থানে যাত্রা করিলেন।

বিজয়গোবিন্দ ও গিরিবালাকে দক্ষিণ-বাবাজপুর পাঠাইয়া দিয়া বিহারীলাল দিন কয়েক অত্যন্ত উদ্বিগ্ন রহিলেন। যখন বিজয়গোবিন্দের নিকট হইতে পৌঁছ-সংবাদ আসিল, তখন তিনি এক প্রকার সুস্থ হইলেন।

এই সময়ে বিহারীর খুল্লতাত প্রভৃতি বিহারীকে বাড়ী লইয়া যাইয়া বিবাহ দিবার জন্য আবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় বিহারীকে লইয়া ভয়ানক গোলযোগ চলিতেছে, ইহা জানিয়া বিহারীর

বাড়ীর সকলে মনে করিয়াছিলেন, এইবার যত্ন করিলে হয়ত বিহারীর মন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তাঁহারা অনেক যুবকের এই প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিয়া দেখিয়া বিহারী সম্বন্ধে আজও একেবারে আশা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; তাঁহারা এই সুযোগে বিহারীকে বাড়ী আনিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। বিহারীলাল অনেক দিন পরে একবার বাড়ী যাইতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু বিবাহ করিবেন, এ চিন্তাকে মনেও স্থান দিলেন না। বাড়ীতে যাইয়া বিহারীলাল আত্মীয় স্বজনের সৎ-ব্যবহারে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন--দেখিলেন, তাঁহার প্রতি কেহ কোন প্রকার অত্যাচার করে না, বরং সকলেই ভাল ভাবে ব্যবহার করিতেছে। বিহারীলাল বাড়ীর সকলের ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন; মনে মনে ভাবিলেন, হিন্দু সমাজের এই উদারতা এবং ধৈর্য্য গুণে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। তিনি ইচ্ছামত বাড়ী বাড়ী গমন করিয়া সকলের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন, অনেকেই বলিল,—'ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাল, তাহা ঠিক, কিন্তু কে প্রকৃত ব্রাহ্ম হইতে পারে?' বেহারিলাল সকলের মন হইতে এই কুসংস্কার দূর করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। যাহা হউক, কিছু দিন বাড়ী অবস্থিতি করিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন ঠিক করিলেন; বিহারীর আত্মীয় স্বজন সকলকে বলিলেন যে, "ব্রাহ্মসমাজে আমার প্রতি যতই অত্যাচার হউক না কেন, আমি কোন সমাজের দাস নহি; এবং ব্রাহ্মসমাজই আমার এক মাত্র লক্ষ্য নহে; ঈশ্বরই আমার এক মাত্র লক্ষ্য, যেখানে যে অবস্থায় থাকিলে দিনান্তে একবার সেই পরমেশ্বরের করুণা স্মরণ করিতে পারি, সেই অবস্থাই আমার এক মাত্র প্রার্থনীয়। আমি আপনার স্বাধীনতা হইতে কোন অবস্থাতেই বঞ্চিত থাকিতে বাসনা করি না।"

বিহারীর আত্মীয় স্বজন বেহারীকে অত্যন্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ দেখিয়া অবশেষে নিরস্ত হইলেন।

বিহারীলাল যথা সময়ে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন,—জীবনের সুখ দুঃখের অবলম্বন, প্রবাসীর হৃদয়ের একমাত্র শান্তির আলয় জন্মভূমির মমতা পরিত্যাগ করিয়া বিহারী জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। যে অপার্থিব ধনের লালসায় বিহারী সংসারের ধন ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ

করিলেন, যে নিগূঢ় তত্ত্ব-সুধার আশায় বিহারী সংসারের ভিখারী হইলেন, এ জগতে তাহার মর্ম্ম কেহই বুঝিল না; সংসারের লোকেরা কেহ বলিল, বাড়ীর আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিরক্ত হইয়া বিহারী ভিখারী হইয়াছে;—কেহ বলিল, ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ আন্দোলনে ব্যথিত হইয়া বিহারী ভিখারীর বেশ ধারণ করিয়াছে। কেহ বলিল, স্বীয় বাসনা পূর্ণ না হওয়ার জন্য অন্তরে কষ্ট পাইয়া বিহারী জীবনের সুখের বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছে। এই প্রকারে নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। বিহারী জন্মভূমির নিকট বিদায় লইবার সময় এই কয়েকটী কথা বলিলেন;—"জন্মভূমি,—এসংসারে সকল আসক্তিই পরিত্যাগ করিয়াছি,—তাই আজ তোমার মমতাও ছিন্ন করিলাম। তুমি আমাকে অকৃতজ্ঞ বলিবে?—আমার দ্বারা তোমার কোন প্রকার উপকার হয় নাই! আমি তোমার নিকট বাস্তবিকই অকৃতজ্ঞ, তোমার ঋণ এজন্মে পরিশোধ করিতে পারিলাম না! কেবল তোমার কেন, এ জীবনে কাহারও ঋণ পরিশোধ করিতে পারি নাই। আমি বুঝিয়াছি, সংসার আমার জন্য নহে,—সংসারের কিছুই আমার জন্য নহে। আমি সংসারে বৃথা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; আমি নরাধম। আমার ভালবাসা তবে ছিন্ন কর;—আমার মমতা তবে বিসর্জ্জন দেও। আমি কি কখনও তোমাকে দেখিব—দেখিয়া দগ্ধ প্রাণকে শীতল করিব? জানি না। এ জীবন কোথায় কি ভাবে শেষ হইবে, ঈশ্বরই জানেন। তবে, জন্মভূমি! আজ জন্মের মত বিদায় হই।"

বিহারী যথাসময়ে কলিকাতায় আসিয়া ঈশানের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জীবনে একটী আত্মার উন্নতির পথের সহায় হইতে পারিলেও বিহারী আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। ঈশানকে রীতিমত বিদ্যা, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া বিহারীর প্রধান কার্য্য হইল, তৎসঙ্গে সঙ্গে ঈশানের দোকানটী যাহাতে ভাল রকম চলিতে পারে, সেজন্যও সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন না। ঈশান বিহারীর উপদেশে দিন দিন সকল বিষয়ে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে লাগিল।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বালিকার প্রতিজ্ঞা।

উত্তাল তরঙ্গময়, প্রশস্ত-বক্ষ মেঘনার কূলে শান্তিনগর নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। বিশাল-বক্ষ মেঘনার তরঙ্গাঘাতে কত অসংখ্য গ্রাম যে বিধ্বস্থ এবং বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা গণনা করা যায় না। শান্তিনগর প্রথমে মেঘনার তীর হইতে প্রায় ৫। ৬ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঐ লীলা ও চাতুর্য্যপূর্ণ নদী প্রসন্নচিত্তে হাসিতে হাসিতে শান্তিনগরের পাদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে,—যেন শান্তিনগরের পদধৌত করাই ইহার লক্ষ্য। শান্তিনগর নদীর তরঙ্গলীলা দেখিতে দেখিতে উল্লসিত হইয়া ক্রমে ক্রমে যেন ইহার বক্ষঃস্থলে স্থান প্রার্থনা করিতেছে, আর চতুর নদী যেন হাসিতে হাসিতে ইহাকে আলিঙ্গন করিতে কর প্রসারণ করিয়াছে!!

মেঘনার পরাক্রমে ভীত গ্রামের অধিবাসীগণ ক্রমে ক্রমে গ্রাম পরিত্যাগ করিতেছে,—শান্তিনগরের মমতা ও ভালবাসার বন্ধন ক্রমে ক্রমে সকলে ছিন্ন করিয়া কেহ নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে, কেহ দূরবর্ত্তী কোন গ্রামে আশ্রয় লাভার্থ গমন করিতেছে।

এই গ্রামে একটী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বাস করিতেন, তাঁহার একটী মাত্র কন্যা ছিল। চারি বৎসর হইল তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। ঐ কন্যাটীকে লইয়া ব্রাহ্মণী একাকিনী সংসারের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই চারি বৎসর অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের জীবিতকালেও ভিক্ষা ভিন্ন দিন চলিত না, এক্ষণেও সেই প্রণালীতেই চলিতেছে;—কিন্তু ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর গ্রামের সকলে কন্যাটীর মুখ চাহিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণে সাহায্য করিতেছে। গ্রামের সকল অধিবাসীগণ যখন দিক্ দিগন্তরে আশ্রয় অন্বেষণে বাহির হইল, তখন ব্রাহ্মণী এই তনয়াকে লইয়া

যেন বিপদ-সাগরে ভাসিতেছেন ;—কোথায় যাইব, কি হইবে, কেমনে কন্যার প্রাণ রক্ষা পাইবে, এই সকল চিন্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। অন্যদিকে বয়স তাঁহার শরীরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আপন পরাক্রমে শরীরের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে ;—শরীরের তেজ, কান্তি, বল বীর্য্য, অস্থি মাংস, মেদ মজ্জা সকলি দিন দিন নিস্তেজ হইতেছে ;—কাল ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণীকে ভ্রূভঙ্গি দেখাইতেছে। ব্রাহ্মণী আজ আছে ত কাল নাই, সে জানিত, শীঘ্রই ঘোরতর অন্ধকার জীবনকে আক্রমণ করিবে,—জানিত,নয় আজ নয় কাল আমি মরিব ! –কিন্তু তখন তনয়ার দশা কি হইবে ? কে হৃদয়ের রত্নটীকে রক্ষা করিবে ? কে কাঙ্গালিনীর সর্ব্বস্বধন একমাত্র তনয়ার পানে তাকাইবে ; কে বৃদ্ধার একমাত্র অবলম্বনকে স্থান দান করিবে ? এই সকল চিন্তায় বৃদ্ধা একেবারে অস্থির হইয়া পড়িতেছেন ; গ্রামের সকলেই আপন আপন চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত ;–এই দুটী অনাথার পানে কেহই তাকাইল না।

কিছুদিন পরে নানা প্রকার ভাবনা ও চিন্তায় বৃদ্ধার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল ;—চিন্তাহারিণী মৃত্যু আসিয়া সমস্ত চিন্তা নির্ম্মূল করিল ;— অবোধ বালিকার মায়া পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা পলায়ন করিলেন।

মাতার মৃত্যুর পর অবোধ-বালিকা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শান্তিনগরের একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালিকাকে আশ্রয় দিয়া রাখিলেন। বালিকা মাতার চিতার ধারে বসিয়া ক্রন্দন করিয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন ;—"মা তুই কোথায় গেলি, –আমার উপায় কি হবে"—ইহাই ক্রন্দনের কথা। চিতা মেঘনার কূলে। নদী কত ভাবে ক্ষণে ক্ষণে বিভীষিকা দেখাইয়া, কখনও বা প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বালিকাকে অন্যমনস্ক করিতে যত্ন করিত, কিন্তু বালিকার মন কখনও বিচলিত হইত না। নদীর বক্ষ দিয়া কত নৌকা চলিয়া যায়,—নৌকার আরোহীগণ 'এইবার বালিকা জলে পড়িল, এইবার গেল' এই প্রকাব কত কথা বলিতে বলিতে নদীর বক্ষে ভাসিয়া যায়, কিন্তু বালিকার মন কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হয় না ;—বালিকা দিন দিন কৃশ, মলিন, শুষ্ক ও জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিলেন। গ্রামের লোকেরা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত, সকলেই একে একে স্থানান্তরে যাইতে লাগিল। যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালিকাকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিলেন ; তাঁহার মনে বালিকার জন্য নানা প্রকার দুর্ভাবনা

উপস্থিত হইল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালিকার গত্যন্তর না দেখিয়া একটী সম্বন্ধ সুস্থির করিলেন। বালিকার ষোড়শ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে। সম্বন্ধের কথা শুনিয়া বালিকা আরো অস্থির হইলেন; মাতার একটী কথা সর্ব্বদাই তাঁহার স্মৃতিপথে জাগিতেছে,—"তুমি কখনও বিবাহ করিবে না;—যিনি তোমাকে আশ্রয় দিবেন, তাঁহাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিবে।" মাতার কথা বালিকার বেদবাক্য, তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। বালিকা অনাথা হইয়াও ঐ কথাকে জীবনের সার করিয়াছেন; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ঐ মেঘনার জলে ডুবিয়া মরিব, তবুও বিবাহ করিব না।

ক্রমে ক্রমে সম্বন্ধ পরিপক্ক হইয়া আসিল, বিবাহের দিন স্থির হইল। ব্রাহ্মণ কুলের মায়ায় ভুলিয়া একটী মূর্খ বৃদ্ধ কুলীনের নিকট বালিকাকে সমর্পণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। বালিকা সহায়হীন, আশ্রয়হীন, ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, না হয় বলপূর্ব্বক বিবাহ দিব। প্রথমে বালিকাকে অনেক প্রবোধ বাক্য দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মায়ের কথা লঙ্ঘন করিয়া অন্য কথা শুনিতে বালিকা যখন কোন রকমেই সম্মত হইলেন না, তখন ব্রাহ্মণ ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিলেন; "তোমাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ দিব।" বালিকা এই কথা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; সমস্ত দিন কাঁদিতে কাঁদিতে গত হইল;—সন্ধ্যার পর একটু নিদ্রা আসিয়া বালিকাকে সান্ত্বনা দিল, বালিকা নিদ্রার ক্রোড়ে স্বপ্ন দেখিলেন;—তাঁহার জননী যেন মস্তকের ধারে বসিয়া কত সান্ত্বনা দ্বারা প্রবোধ দিতেছেন; বলিতেছেন, "কুসুম, ভয় কি? তুমি নিরাশ্রয় হইয়াছ বলিয়া কাঁদিতেছ? আর কাঁদিও না;—আমি তোমার নিকটেই আছি। মা কি তনয়াকে ছাড়িয়া দূরে থাকিতে পারে? আমার কথা লঙ্ঘন করিও না, তোমার কোন চিন্তা নাই;—সংসারে কেহই নিরাশ্রয় নহে;—ভগবতী তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া রহিয়াছেন;—সমস্ত বিপদ হইতে তিনি তোমাকে উদ্ধার করিবেন। মায়ের চরণ পূজা করিতে ভুলিও না, মা ভবানীকে স্মরণ কর—তিনি তোমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।"

স্বপ্নে মাতার এইরূপ বাক্য শ্রাবণ করিয়া কুসুম ক্রন্দন স্বরে বলিলেন, "—মা, আমার সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত; আমাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ দিতে পিতা প্রস্তুত হইয়াছেন। মা! আমাকে রক্ষা কর, আমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া তোমার ঐ নিরাপদ দেশে লইয়া চল।"

মাতা একথা শুনিয়া যেন বলিলেন—'আমি তোমাকে ক্রোড়ে তুলিলেই রক্ষা করিতে পারি না ;—মা অভয়া তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার সেবা কর, আমাকে ভুলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও তুমি যদি মাতার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হও, ভগবতী তোমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।"

এই কথা শুনিতে শুনিতে বালিকা ভগবতীকে একমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালের জন্য বালিকার সকল চিন্তা যেন চলিয়া গেল, মা অভয়া যেন বালিকাকে নির্ভয় করিলেন।

ক্ষণকাল পরে এ সমুদায় চিত্র সহসা বিদূরিত হইল, সহসা বালিকার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, দেখিলেন, তিনি যেখানে পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, সেই স্থানেই পড়িয়া রহিয়াছেন। জাগরিত হইয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন ;—ভাবিতে লাগিলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছি ; - না সত্যই জননীকে দেখিয়াছি ? এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে বালিকা শ্মশানে মাতার চিতার নিকটে গমন করিলেন। সেখানে বায়ু সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া রজনীর গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে ;—মেঘনার জল মৃদু মৃদু কল কল নাদে যেন তীরের ধারে আসিয়া বালিকাকে বলিতেছে,—"ভয় কি কুসুম,—তোমার মাতা আমার বক্ষে,—তুমিও আমার বক্ষে স্থান পাইবে।" কুসুম-কলিকা এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও কিছু নাই ; তিনি আস্তে আস্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—প্রাণ থাকিতে মায়ের কথার অন্যথা করিব না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কুসুম-কলিকা।

ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা কুসুম-কলিকা সকলি বুঝিতে পারেন। মাতা কি কারণে বলিয়া গিয়াছেন—"কুসুম বিবাহ করিও না," তাহা কুসুম বেশ বুঝিতে পারিতেছেন ; কুলীন কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি যখন, তখন বিবাহ এক প্রকার নরক যন্ত্রণা! কুসুমের চক্ষের সম্মুখে কত

বালিকা, যুবতী ও বৃদ্ধা বিবাহিতা হইয়াও বিবাহ-শূন্যের ন্যায় বিষাদে সময় কর্ত্তন করিতেছে। কুসুমের জন্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ যে একটী পাত্র ঠিক করিয়াছেন, তাহার বয়স পঞ্চাশৎ বৎসরের কিঞ্চিদধিক হইবে; ইতিপূর্ব্বে তিনি ৩০টী বিবাহ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কুসুমের জন্য অতি উপযুক্ত পাত্র ঠিক করিয়াছেন!

কুসুম দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা, সকল প্রকার আভরণ শূন্য,—একখানি ভাল কাপড় কখনও কুসুমের শরীরকে শোভাযুক্ত করে নাই। যাহার উদরের অন্ন মিলে না;—তাহার আবার বস্ত্র আভরণ! কুসুমের অঙ্গ কোন প্রকার কৃত্রিম শোভায় ভূষিত নহে, কিন্তু প্রকৃতি কুসুমকে আশ্চর্য্য ভূষণে সজ্জিত করিতেছে;—নানারূপ নব-শোভায় ঐ দরিদ্র মলিনাকে সাজাইয়া তুলিতেছে। কুসুমের শরীরের শোভার সহিত মনের শোভাও পরিস্ফুত হইতেছে;—হৃদয় মনে যেন সরলতার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইতেছে। কুসুমের মাতা অতি আদরে কুসুম নাম রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কুসুম আজও কুসুম নহে; আজও কলিকা মাত্র। এ কলিকা কালে প্রস্ফুটিত হইবে,—প্রকৃতির ভাবগতিক দেখিয়া তাহা অনুমান হইতেছে; কিন্তু এ অরণ্যে এ কুসুম কেন প্রস্ফুটিত হইবে;—এ কলিকা কেন অঙ্কুরিত হইবে? বিধাতার লীলা, বিধাতাই দেখুন;—এ কুসুম ফুটিলেও আমরা ইহাকে কলিকা মাত্র বলিয়া জানিব।

পঞ্চাশৎ বৎসরের বৃদ্ধ হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইয়া প্রণয়ের আশায় বালিকার পানে ধাবিত হইয়াছে, এ চিত্র স্মরণে কাহার মনে না বিস্ময় জন্মে, কাহার মনে না ঘৃণার উদ্রেক হয়? মানুষ কি দুর্দ্দমনীয় রিপুর অধীন!—কাল সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া সংসার-বৈরাগ্যের চিত্র সম্মুখে ধরিলেও মানুষ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, তাহাকে কল্পনায় দূরে রাখিয়া, সংসারের নবীন প্রেমিকের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া দিকদিগন্তরে ধাবিত হয়। হতভাগ্য বঙ্গদেশে আমরা সব দেখিলাম। এই হতভাগ্য দেশে রমণীর হৃদয় যদি কষ্টসহিষ্ণু না হইত, নারীর হৃদয় যদি কুসংস্কারাপন্ন না হইত, তবে এ দেশে প্রেম, প্রণয়, ভালবাসার লেশমাত্র তিষ্টিতে পারিত কি না, সন্দেহ। পঞ্চাশবৎসর যাহার মস্তকের উপর ঘুরিয়া গিয়াছে, সে কিনা প্রণয়ের আশায় আপন পুত্র কন্যার সমবয়স্ক বালিকার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি ফিরাইতেছে, ইহা দেখিলে কাহার হৃদয় না দুঃখে ও ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয়? অথচ বঙ্গপ্রদেশে এই উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিদিন এরূপ কত বালিকা

মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিতে বাধ্য হইতেছে!! একটী দুটী নয়, কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে ঘরে এ চিত্র বিদ্যমান!! আমরা চক্ষু থাকিতে অন্ধ—হৃদয় থাকিতে পাষণ্ড। কত কুসুম ফুটিতে ফুটিতে বৃদ্ধ পতির শ য্যার পাশ্বে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, কে তাহার গণনা করে?—করিতে পারে বা কে?

হায়, কুসুম-কলিকার ভাগ্যেও কি এই ছিল!! বিধাতা কেন তবে এ কুসুমকে কুলীনের ঘরে রাখিলেন?—রাখিলেন ত কেন প্রস্ফুটিত করিলেন?—প্রস্ফুটিত করিলেন ত কেন ইহাকে শোভাহীন করিলেন না? হায়, হায়, মাতৃহীনা, পিতৃহীনা কুসুম, তোমার জীবনেও এত দুঃখ ছিল! বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। উপায়হীনা, কুসুম-কলিকা চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতেছেন;—ভরসা একমাত্র ভগবতীর চরণ, মাতার আদেশে অনাথা দিন রাত্রি ভগবতীকে ডাকিতেছেন! আর নির্জ্জনে মেঘনার কূলে বসিয়া বলিতেছেন,—"শান্তিনগর, তুমি আজও রহিয়াছ! ঐ নদী ঐ মেঘনা তোমার প্রেমের ভিখারী হইয়া তোমার পদ-সেবা করিতেছে,—দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত তরঙ্গের উপর তরঙ্গ দ্বারা আঘাত করিয়া তোমাকে পরিতুষ্ট করিতেছে। তুমি আর কেন অপেক্ষা করিতেছ? তুমি কত রমণীকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া দিয়াছ;—আশ্রয়হীন, অবলম্বনহীন করিয়া কত রমণীকে অকূল পারাবারে বিসর্জ্জন দিয়াছ! তোমার মনেও এত ছিল;—কত অবলার প্রেম, কত অবলার প্রণয়, কত অবলার হৃদয় তুমি ছিন্ন করিয়াছ, —তুমি পাষাণ, নচেৎ অবলার চক্ষের জলে তুমি এতদিন ভাসিয়া যাইতে। পৃথিবীতে সকল পাপেরই দণ্ড আছে,—সকল সুখেরই বাঁধা আছে, পৃথিবীতে সকল প্রকার অহঙ্কারই কালে চূর্ণ হয়। তুমি পাষাণ কত অবলাকে তুমি বিষাদের সাগরে ভাসাইয়াছ,—তাহার কি দণ্ড পাইবে না? ঐ দেখ মেঘনা স্ফীত বক্ষে তোমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে;—একটু একটু করিতে করিতে তোমার সর্ব্বস্ব ঐ অতল সলিলে নিমগ্ন হইতেছে! তুমি আজ আছ, আর কিছুদিন পরে তোমার চিহ্নও থাকিবে না,—তোমার কলঙ্করাশির সহিত তুমি ঐ মেঘনার অতলস্পর্শ বারির নিম্নে লুক্কায়িত হইয়া যাইবে। তোমার উন্নত মস্তক নত হইবে, তোমার দর্প চূর্ণ হইবে। এ সকল তুমি অবশ্য বুঝিতেছ। কিন্তু দিনে দিনে একটী একটী অঙ্গাভরণ অঙ্গ হইতে খুলিয়া ঐ তরঙ্গকে ভুলাইবার জন্য উপঢৌকন দিতেছ কি নিমিত্ত? আর

কিছু দিন থাকিতে? থাকিয়া এই অনাথার জীবনকে ডুবাইতে? ডুবাইয়া তোমার সাধ মিটাইতে? মা অভয়া আমার সহায়, আমি ভীতা নহি। তোমার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে,—এখনও অনুতপ্ত হও, তোমার এ কলঙ্কের মুখ শীঘ্র ঢাকো, নচেৎ মা অভয়ার প্রসাদে ঐ মেঘনার সলিলে তোমাকে বিসর্জ্জন দিব।"

বালিকা ক্ষণকাল স্থিরভাবে থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন; "—মেঘনা,—লোকে তোমাকে অকৃতজ্ঞ বলে, কৃতঘ্ন বলে, হিংসাদ্বেষপূর্ণ বলে, কিন্তু আমি বলি, তাহারা ভ্রান্ত। তুমি না থাকিলে পাপের প্রতি লোকের ঘৃণা হইত না;—তুমি না থাকিলে পাপের যথার্থ দণ্ডবিধান হইত না। শান্তিনগর আজ যায়, কাল যায়, আর থাকে না। শান্তিনগরের অহঙ্কার এতদিনে তুমি চূর্ণ করিতে আসিয়াছ। কিন্তু আর বিলম্ব কেন? শান্তিনগর যতদিন আছে, আমার জীবনের আশা তত দিন হৃদয়ে স্থান পাইবে না। শান্তিনগরই আমার জীবন-নাশক হইয়া পথে দাঁড়াইয়াছে; এই সময়ে তুমি সহায় হও, নচেৎ আর উপায় নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে কুসুম-কলিকার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল; ক্ষণকাল পর গৃহের দিকে ফিরিলেন; পথে নির্ভয়ে প্রাণ ভাসাইয়া গাইতেছিলেন,—"ওমা অভয়ে, আমি দুর্গা বলে যাত্রা করি, রেখ না অভয় চরণে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মধুর আহ্বানে।

এক দিন, দুদিন, তিন দিন, এই রকম করিয়া বিবাহের মধ্যের বাকী কয়েকটী দিন চলিয়া গেল,—কিন্তু বালিকা কুসুম-কলিকার অভিলাষ পূর্ণ হইল না,—মা অভয়া বালিকার মুখ পানে তাকাইলেন না। কুসুম-কলিকার সকল দিক যেন আঁধার হইয়া আসিতে লাগিল।

বিপদে পড়িলে মানুষের সাহস, শক্তি, বল, বিক্রম সকলই বৃদ্ধি পায়। সামান্য কীটাণু পর্য্যন্ত বিপদের সময় অসীম পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া বিশ্ব-স্রষ্টার মহিমা ঘোষণা করে। শক্তি বল, বুদ্ধি বল, সাহস বল, বিপদে

পড়িলে আত্ম-রক্ষার জন্য এ সকলি বিশ্বস্রষ্টার করুণারূপে মানব মনে উদিত হয়। যে পৃথিবীর সকল প্রকার শক্তিভ্রষ্ট, সংসারে যাহার আর কোন অবলম্বন নাই, বিপদের সময় তাহার আত্মরক্ষার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তা সকলি মঙ্গলময়ী বিশ্ব-জননী সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া যোগাইতে থাকেন। লোকে স্বীকার করুক বা না করুক, মা অভয়া সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বিধান করিয়া রাখেন।

যদি তাই সত্য হয়, তবে বালিকা কুসুম-কলিকা আজ কেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইতেছে? আজ কেন বালিকা চতুর্দ্দিক আঁধারময় দেখিতেছে, আজ কেন ইহার মরিতে ইচ্ছা হইতেছে? মানুষ বলিয়া থাকে, স্রষ্টার সকল নিয়ম সব স্থানে খাটে না। মানুষ বলে, যে দুঃখ পাইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, স্বয়ং ঈশ্বরও তাহাকে সুখী করিতে পারেন না।

কুসুম কি হইবে? কি ভাবিতেছ? মায়ের প্রতি অভক্তি হইতেছে? মায়ের চরণ পরিত্যাগ করিয়া নিজের শক্তির পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে? তুমি মনে ভাবিতেছ, মায়ের স্মরণাপন্ন না হইয়া নিজে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলে একটা উপায় হইত? তবে চেষ্টা কর, তবে উপায় অন্বেষণ কর! কিন্তু উপায় কোথায়? কে তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবে, তুমিতো বালিকা;—কে তোমার সহায় হইবে, তুমিতো অনাথা!

হায়, হায়, দিন আর থামিল না, ঐ সূর্য্য, আর ঐ চন্দ্র যেন জেদ রক্ষা করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া যাইতেছে;—দিন যায় রাত্রি আসে;—রাত্রি যায় দিন আসে। কি বিপদ, অনাথার কপাল বুঝি তবে ভাঙ্গিল!

বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রি পর্য্যন্ত কুসুম কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। নানা প্রকার ভাবনায় বালিকার চক্ষে নিদ্রা বসিল না;—কেবল মনে করিতেছেন, "কালই সর্ব্বনাশ হইবে;—মায়ের কথা আর রক্ষা করিতে পারিলাম না।" ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি গাঢ়তর হইয়া আসিল, গ্রাম নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। পূর্ব্ব গগনে অল্পে অল্পে চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে আসিয়া দেখা দিল, দেখিতে দেখিতে পৃথিবী অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইল। চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ জ্যোতি নীলাকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, নক্ষত্রমণ্ডলী তাহা দেখিয়া একটু একটু মৃদু হাসিল। বিমল জ্যোতি গ্রামের বৃক্ষের পত্রে পত্রে, গৃহে গৃহে পড়িয়া কি মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে! চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, নীরব,—কেবল সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া বায়ু বৃক্ষকে সতর্ক করিয়া দিতেছে।

দুপ্রহর রজনীর সময় হঠাৎ বালিকার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল, বালিকা নির্ভয়ে গৃহ হইতে বাহির হইয়া মেঘনার কূলে গমন করিলেন। মেঘনার বিশাল বক্ষে চন্দ্রমার বিমল জ্যোতি পড়িয়া কি আশ্চর্য্য শোভা পাইয়াছে;—বায়ু মৃদু মৃদু ভাবে বক্ষকে ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া কল কল-নাদ উৎপাদন করিয়া যেন কি শ্রুতি-মধুর সঙ্গীত গাইতেছে। বালিকা মেঘনার কূলে একাকিনী;—নির্জীব শরীর আজ সজীব হইয়াছে। কুসুমের প্রকৃত সৌন্দর্য্য শোভা পাইতেছে, সোণার বরণে চন্দ্রমার বিমল জ্যোতি পড়িয়া বালিকার সৌন্দর্য্য যেন শত গুণে বর্দ্ধিত করিতেছে। কুসুমের মাত্র এক খানি ধূতি পরিধান,—বিম্বাধর অলক্ত-রঞ্জিতের ন্যায় কি মধুর শোভা পাইতেছে! কে বলে কুসুম বালিকা? কুসুম কি বালিকা? না—ঐ জ্যোৎস্না নিষ্ঠুর ভাবে কুসুমের সর্ব্ব শরীর যেন অনাবৃত করিয়া দিতেছে! —কোমলে কোমল, মধুরে মধুর, ফুলে ফুলে মন-মুগ্ধকর কোলাকুলি হইয়াছে;—সোণার অঙ্গে সোণার চাঁদের জ্যোতি কি অপূর্ব্ব রূপ ধরিয়াছে! কুসুমের কান্তি কুসুমকে বালিকা বলে না, কুসুমের মূর্ত্তি কুসুমকে বালিকা বলে না। আর পাঠক, তুমি কুসুমের সাহস দেখিতেছ, তুমি কখনও কুসুমকে বালিকা বলিতে পারিবে না; কারণ ঐরূপ গম্ভীর মূর্ত্তি কখনও বালিকার থাকিতে পারে না। তবে বল, কুসুম ফুটিয়াছে।

মেঘনার কলকল নিনাদের মর্ম্ম কুসুম বুঝিলেন। চন্দ্রমার সে মন-মুগ্ধকর আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া বালিকা উন্মত্ত হইলেন; বলিলেন,—'তুই নির্লজ্জের ন্যায় কেমনে তোর সখাকে আলিঙ্গন করছিস্? আর আমি যে কাঙ্গালিনীর ন্যায় এই ভরা যৌবন মস্তকে লইয়া তোর প্রেম-ভিখারিণী হয়ে এসেছি, আমার পানে একবারও চাহিলিনে? এ জীবন তোকেই উপহার দেব, না হলে মায়ের কথা আর পূর্ণ হয় কই? এ যৌবন লইয়া তোকেই আলিঙ্গন করিয়া বক্ষকে শীতল কর্‌ব, নচেৎ মায়ের কথা যে মিথ্যা হবে। তবে ক্ষান্ত হ,—ঐ রঙ্গ ছেড়ে দে। না;—তা তুই পারিস্ নে। ঐ চন্দ্রমা তোর নিত্য-সহচরী। আর আমি? কেবল মাত্র আজ আসিয়াছি। তুই নিত্য-সহচরীর মমতা ছেড়ে কি আমাকে আলিঙ্গন কর্‌বি? তুই তা পারিস্ নে! ঐ চন্দ্রমার নিত্য নব যৌবন; কালের পরাক্রম ওখানে হার মানে। আর আমার? আমার যৌবন আজ আছে ত কাল নাই। তুই আমাকে কি আলিঙ্গন কর্‌বি? আমি কলঙ্কিনী, আমার রূপে কলঙ্ক আছে, লোকে যাহাই বলুক,

আমি জানি, চাঁদের ঐ জ্যোতি নিষ্কলঙ্ক। আমি তা সকলি বুঝি; কিন্তু আমার যে আর উপায় নাই। আজ যদি তুই আমাকে ছেড়েদিস্, তাহলে কাল আমার দশা কি হবে? এ ভরা কি কর্দ্দমে নিক্ষেপ কর্ ব? এ ভরা কি বিষের হাতে সমর্পণ কর্‌ব? এ সৌন্দর্য্যরাশি কি পক্ক-শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধের গলিত চর্ম্মের সহিত বিনিময় কর্‌ব? তা পারিনে, জীবন থাক্‌তে পারিনে। তবে তুই কর প্রসারণ করে আমাকে ধর, এ যৌবন, এ সৌন্দর্য্য রাশি তোকেই উপহার দি। ধর, নে,— এই বলিয়া কুসুম-কলিকা ধীরে ধীরে এক পা দুপা করিয়া মেঘনার সলিলে অবতরণ করিলেন। মেঘনার সলিল তর তর শব্দে স্ফীত হইয়া কুসুমকে আলিঙ্গন করিল। কুসুমের চতুঃপার্শ্বে চন্দ্রমার জ্যোতি উচ্ছ্বসিত সলিলে বিদ্যুতের ন্যায় চক্‌মক্ করিয়া উঠিল। অবোধ বালিকা সে হাস্য দেখিয়া ভয়ে, লজ্জায় অধোমুখে আবার তীরে উঠিলেন। মেঘনা যেন এবার নির্লজ্জ হইয়া পড়িল, কুসুম যাই উপরে উঠিলেন, মেঘনা অমনি তরঙ্গ-রাশি প্রসারণ করিয়া প্রকাণ্ড এক ভূমিখণ্ডকে আপন বক্ষে গ্রহণ করিল; যেন বলিতে লাগিল, "কুসুম আর কেন, নির্ভয়ে এস, তোমার জননী আমার বক্ষে, তুমিও আমার বক্ষে স্থান পাইবে।" মেঘনার স্রোত চন্দ্রমার রশ্মি ধারণ করিয়া এই প্রকারে কুসুমকে ডাকিতে ডাকিতে যেন চলিতে লাগিল। কুসুমও সেই আহ্বানে স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। নির্লজ্জ বালিকা মেঘনার তীর ধরিয়া স্রোতের সহিত চলিলেন। কোথায় চলি-লেন, তাহা তিনি আপনিও জানিলেন না, আপনিও বুঝিলেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দস্যুর হস্তে।

সেই জ্যোৎস্নাময়ী গভীর রজনীতে কুসুমকলিকা অন্যমনস্ক হইয়া মেঘ-নার কূল ধরিয়া চলিতে চলিতে অনেক দূর গমন করিলেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, আকাশে চন্দ্রমার জ্যোতি ক্রমে ক্রমে যেন আরো ফুটিতেছে, ক্রমে যেন আরো উজ্জ্বল হইতেছে। বালিকা কেবল মেঘনার ঐ একটী কথা ভাবিতেছেন,— 'তোমার মাতাও আমার বক্ষে, তুমিও আমার বক্ষে স্থান পাইবে।' বালিকা কেবল ভাবিতেছেন, কিন্তু মেঘনার সলিলে ঝাপ দিতে পারিতেছেন না। কেন

পারিতেছেন না? পৃথিবীতে কুসুমের সাধের এমন কি আছে যে, যাহার মায়ায়ভুলিয়া বালিকা জীবন বিসর্জ্জন দিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন? কেহই নাই, কিছুই নাই। কুসুমও জানিতেন, পৃথিবীতে কেহই তাহার আপন নহে, পৃথিবীতে তাহার আপনার বলিবার কোন পদার্থই নাই। তবে কেন কুসুম রহিয়াছেন? একমাত্র জীবনের মায়ায়। অব্যক্ত ভাষায় কুসুমের অন্তরে যে ঈশ্বরের কয়েকটী কথা অঙ্কিত রহিয়াছে, উহাই কুসুমের সর্ব্বনাশের মূল; নচেৎ এ সোণার প্রতিমা এতক্ষণ মেঘনার সলিলে বিলীন হইয়া যাইত। কুসুম ডুবিতে পারিলেন না, কুসুম ধীরে ধীরে স্রোত ধরিয়া তীরে তীরে চলিলেন।

অনেক দূরে যাইয়া কুসুম দেখিলেন, তীরের ধারে দুই খানি নৌকাতে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে; লাঠির উপর লাঠির আঘাতে ভয়ানক শব্দ হইতেছে। কুসুম নির্ভীক অন্তরে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একখানি নৌকা দস্যুর হাতে পড়িয়াছে। দস্যুরা আরোহীগণকে প্রহার করিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছে। এই নিস্তব্ধ গভীর রজনীতে কেন এ নৌকা এই বিপদসঙ্কুল মেঘনার কূলে আসিয়াছিল? হায় হায়, এই দুঃসময়ে পুলিশই বা কোথায়? পুলিশ? পুলিশের ন্যায় ভয়ানক দস্যু বাঙ্গালায় আর নাই। ইহারা বিপদগ্রস্ত লোকের সহায়তা না করিয়া বরং দস্যুদিগেরই সহায়তা করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে ইহারা নিজেরাই এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পথিকদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া থাকে। কুসুমকলিকার এ চিত্র দেখিয়া অন্তরে দারুণ কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি যখন নৌকার সন্নিকট হইলেন, তখন দস্যুদিগের কার্য্য এক প্রকার শেষ হইয়াছে; তিনি আস্তে আস্তে বিপদগ্রস্ত নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। নৌকা কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইবে, এ সকল বিষয় জানিতে তাহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, কিন্তু নৌকায় উঠিয়া দেখিলেন, দুইজন লোক প্রায় মৃত্যু-মুখে পতিত। কুসুমকলিকা নানা প্রকারে বুঝিলেন, এ নৌকা শান্তিনগর যাইবে, আরো বুঝিলেন,—যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবার কথা ছিল, সে বৃদ্ধও ঐ নৌকায় দস্যুদিগের আঘাতে মৃতবৎ হইয়া পড়িয়াছে। কুসুমের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, তিনি অবিলম্বে নৌকা হইতে তীরে উঠিলেন। তীরে উঠিয়া কিছুদূরে যাইয়া দেখিলেন, একটী ছোট স্রোতস্বতী তাহার গম্য পথকে দ্বিখণ্ড করিয়া রহিয়াছে। তিনি ক্ষণকাল সেই ক্ষুদ্র খালের ধারে বসিয়া কি দেখিলাম, কি করিলাম, কি

করিব, ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। কি দেখিলাম?—কুসুম ভাবিলেন, যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার পথ বেশ পরিষ্কার বোধ হইতেছে। বিবাহের আশঙ্কা এক প্রকার নির্ম্মূল হইয়াছে, কারণ ঐ বৃদ্ধ ক্ষণকাল পরে মরিবে। তবে কি গৃহে ফিরিব? শান্তিনগর কলঙ্কের আধার, ঐ কলঙ্করাশি, হয় আজ, নয় কাল, মেঘনার গভীর বক্ষে বিলীন হইয়া যাইবে! শান্তিনগরের মমতা পরিত্যাগ করিয়াছি,—সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছে, সকলেই স্থানান্তর যাইতেছে; তবে আমি কোথায় যাইব? এই ভূমণ্ডলে আমার আশ্রয় কোথায়? মা বলিয়াছেন, যাহার আর কোথাও আশ্রয় না থাকে, মা ভবানী তাহার একমাত্র আশ্রয়। এ জীবনে মা ভবানীই আমার একমাত্র আশ্রয়! আমার এ ভরা যৌবন লইয়া কোথায় যাইব,—কাহার জন্য এ ভরা বহন করিব? বিপদ-উদ্ধারিণী মা অভয়া আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আমার জীবনের ভবিষ্যতে কি হইবে? এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে কুসুম-কলিকা ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। সম্মুখে তাহার আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই, সম্মুখে খাল। পশ্চাতে ফিরিতে ইচ্ছা নাই। রজনী ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, চন্দ্রমা কুসুমের মস্তক প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিমগগনে আশ্রয় লইয়াছে;—কুসুম উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই স্থানে বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। এই অবসন্ন অবস্থায় ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা আসিয়া তাহার চক্ষুকে আক্রমণ করিল; কুসুম সেই অবস্থায় সেই স্থানে নিদ্রার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ক্ষণকাল সকল ভাবনা ভুলিলেন।

দস্যুদিগের নৌকা ক্ষণকাল পরে ঐ খালে আসিয়া উপস্থিত হইল, ঐ খাল দিয়াই তাহারা যাইবে। কুসুম নিদ্রার ক্রোড়ে লুক্কায়িত হইয়াছেন বলিয়াই তিনি মানুষের চক্ষের অগোচর হইতে পারেন নাই;—নিষ্ঠুর চাঁদ তাহার শরীরে, তাহার মুখে পড়িয়া সকল অপ্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে;—পথিকদিগকে যেন এই কমলটীকে তুলিয়া লইতে বলিতেছে! দস্যুরা সকলেই একে একে কুসুমকে দেখিল। সকলেরই ঐ রত্নটীকে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা হইল!! সুতরাং দস্যুদের নৌকা তীরে সংলগ্ন হইল।

হা কুসুম, তুমি এক্ষণে নিদ্রিতা,—নিদ্রা তোমাকে এখন সকল ভাবনা হইতে দূরে রাখিয়াছে, কিন্তু তোমার জীবনে দেখ কি বিপদ চতুর্দ্দিক হইতে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। তুমি নির্ভাবনায় নিদ্রা যাইতেছ,—কল্য তোমাকে সে জন্য বিষম অনুতাপে পড়িতে হইবে।

দস্যুরা কুসুমের নিকটে অগ্রসর হইল—এ প্রকার চিত্র তাহারা আর কখনও দেখে নাই, এ প্রকার সৌন্দর্য্য তাহাদের নয়ন আর কখনও দেখিয়া তৃপ্ত হয় নাই। দস্যুরা একে একে সকলে কুসুমের নিকটে অগ্রসর হইল, তবুও কুসুমের নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। সকলেই অবাক হইয়া কুসুমের অপ-রূপ দেখিল।

দস্যুরা কুসুমকে দেখিয়া অবাক হইল ;—কোথা হইতে এই দেবকন্যা আসিয়াছেন, কেনই বা ধরা-শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন, ইহা তাহারা কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। ইহাকে লইয়া গেলে আবার বিপদ ঘটিবে, অনেকেই এ আশঙ্কা করিতে লাগিল। অবশেষে উহাদিগের মধ্য হইতে একজন দস্যু বলিল,—যা হয় হবে, নিতেই হবে। এই বলিয়া কুসুমকে ধরা-ধরি করিয়া নৌকায় তুলিল। অবোধ কুসুম নিদ্রায় অচেতন রহিলেন, দস্যুরা কুসুমকে লইয়া নৌকা খুলিয়া নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

পরদিন শান্তিনগরে মহা কোলাহল উঠিল। দস্যু-লুণ্ঠিত বরের নৌকা যথা সময়ে শান্তিনগরে উপস্থিত হইল, কিন্তু বৃদ্ধ বর মা ভবানীর কৃপায় কুসুমের পরিবর্ত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে চলিলেন। এদিকে কুসুম-কলিকা কোথায় গেল, কি হইল, এই কথা গ্রামের ঘরে ঘরে শ্রুত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তিনিই এই!

দস্যুরা কুসুমকে লইয়া কি করিল, পাঠক, তাহাও শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে? দুর্ব্বৃত্ত পশু অপেক্ষাও ঘৃণিত নীচাশয় দস্যুগণের হস্তে পড়িয়া কুসুম কি করিতেছেন, জানিতে ইচ্ছা হইতেছে? তবে শুন। নৌকা খুলিয়া দিয়াই দস্যুরা কুসুমকে জাগরিত করিল!—মিষ্ট কথায় নহে, অত্যাচারে। কুসুম নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে দস্যুগণ বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। দস্যুরা স্বীয় স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য উল্লাসে খল খল করিয়া হাসিতেছে, কেহ বা বগল বাজাইয়া নৃত্য করিতেছে, কেহ বা তাল-

ভাঙ্গা স্বরে গান করিতেছে। কুসুম দেখিয়া শুনিয়া জীবনের আশায় জলাঞ্জলী দিলেন। বুঝিলেন, ক্ষণকালের মধ্যে দস্যুরা যাহা করিবে, তাহা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মরিবার উপায় কি? কুসুম ভাবিলেন, মেঘনার জলে কেন ডুবিলাম না? মেঘনার সলিলে এ কলঙ্কের বোঝা,এ মন-মজানে রূপ কেন ডুবাইলাম না? কুসুমের আর ভাবিবার অনেক সময় নাই, মনে করিলেন, একটু সুবিধা পাইলেই জলে ঝাঁপ দিয়া মরিব।

দস্যুরা জানিত, কুসুমকে তাহারা বাড়ী লইয়া যাইতে পারিবে না, কারণ তাহা হইলে বিষম গোলযোগে পড়িতে হইবে। তাহাদের ইচ্ছা, রিপু চরিতার্থ করিয়া কুসুমকে জলে ডুবাইবে কিম্বা অস্ত্রাঘাতে বধ করিয়া জলে ভাসাইয়া যাইবে, এই রূপ তাহাদের বাসনা ছিল। কিন্তু তাহা হইল না;—কোন কোন দস্যু বলিতে লাগিল, এমন রত্নকে কখনও জলে নিক্ষেপ করা যায় না, যত বিপদই ঘটুক, ইহাকে বাড়ী নিয়ে যেতে হবে। কোন দস্যু বলিল, পরের কথা পরে। দস্যুদিগের দলপতি, কি কারণে তাহা ঈশ্বরই জানেন, সহসা দস্যুদিগকে নিরস্ত হইতে বলিয়া কুসুমের নিকটে যাইয়া নম্রভাবে বলিল, তুমি নদীর ধারে পড়েছিলে কেন?

কুসুম দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, একবার মনে ভাবিলেন, এই পামরদিগের নিকট দুঃখের কথা বলিলে কি হইবে; আবার ভাবিলেন, ইহাদের হাতে যখন প্রাণ যাবে, তখন আর মনের কথা গোপন করে দরকার কি। এই রূপ ভাবিয়া কুসুম আদ্যন্ত সকল কথা বলিলেন। কুসুমের জীবনের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া দস্যুদিগের কাহারও কাহারও একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইল। দলপতি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল;—এখন তুমি কি চাও?

কুসুম বলিলেন; 'আর কিছুই চাই না, তোমাদের অস্ত্রের আঘাতে প্রাণে মরিতে চাই। তোমাদের নিকট এই প্রার্থনা, আমাকে শীঘ্র মেরে ফেল।

দস্যুশ্রেষ্ঠ বলিল,—তুমি মর্‌তে চাচ্ছ কেন? মরা ভিন্ন তোমার আর কি ইচ্ছা আছে?

কুসুমের নয়ন হইতে জল পড়িতে লাগিল, ক্রন্দন স্বরে বলিলেন;—আমার ধর্ম্ম যদি তোমরা রক্ষা কর, তবে তোমাদের আশ্রয়ে যাই।

দস্যু বলিল, তাই হবে, তোমার কোন্ ভয় নাই। কিন্তু তুমি আমাদের কোন অনিষ্ট কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে তোমাকে মেরে ফেল্‌ব।

কুসুম বলিলেন, তা এ প্রাণ থাক্‌তে হবে না। আমি যাহার আশ্রয়ে থাক্‌ব, সে আমার পিতার ন্যায়; আমা হতে তার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

দস্যু-দলপতি যখন এই প্রকার কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল, তখন আর আর সকলেই চুপ্‌ করিল।

যথা সময়ে দস্যুরা কুসুমকে লইয়া বাড়ীতে পৌঁছিল। দস্যু-শ্রেষ্ঠ এবার টাকা কড়ি আর আর সকলকে ভাগ করিয়া দিল, নিজে কিছুই গ্রহণ করিল না; সকলকে বলিল, টাকার বদলে আমি এই মেয়েটীকে নিলাম, ইহাকে পালন করা আজ আমার হত জীবনের একটী কাজ হলো। আজ হতে আমি তোমাদের সঙ্গ ছাড়্‌লাম, এ কার্য্যে আর কখনও আস্‌ব না, আজ হতে আমি এ সকল ছাড়্‌লাম।

দস্যুদিগের দলপতির এই প্রকার ভাব দেখিয়া দস্যুগণ সকলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, সকলে অধোবদনে স্ব স্ব ভবনে গমন করিল। দস্যুপতি কুসুমকে লইয়া আপন ঘরে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ের পর হইতে দস্যুদলপতি কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহাতেই প্রবৃত্ত হইল। কুসুম দস্যুর সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া ইহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিলেন। জননীর আদেশ ছিল, যাহার আশ্রয়ে থাকিবে, তাহাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। একথাটী কুসুম আজও ভুলিতে পারেন নাই। তিনি দস্যুকেই পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কুসুমের স্বভাব-সুলভ ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া দস্যু ক্রমে ক্রমে আপন জীবনের সকল অন্যায় আচরণ বুঝিতে পারিলেন; কুসুমের স্বভাবের আদর্শে তাহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। দস্যু কুসুমের নিকট এক দিন বলিলেন,—"মা তুমি আমাকে ক্ষমা কর, না হলে আমার আর নিস্তার নাই।" কুসুম দিন দিন দস্যুর স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। দস্যুও ক্রমে ক্রমে পরোপকারকে জীবনের একটী সারব্রত মনে করিয়া লইলেন। এই প্রকারে কুসুম দস্যুর জীবনের পরিবর্ত্তনের একটী প্রধান সহায় হইলেন; দস্যুও নিরাশ্রয়া কুসুমের এক মাত্র আশ্রয় হইল।

মঙ্গলময় ঈশ্বর কোন্‌ ঘটনায় কোন্‌ প্রণালীতে মানবকে উদ্ধার

করেন, ইহা ভাবিয়া গ্রামের সকলে বিস্মিত হইল। দস্যু দলপতি দীন দুঃখীর ন্যায় কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

উপরে যে দস্যু-কৃষকের কথা বলা হইল, ঐ কৃষকের নাম ঈশান মণ্ডল। আর ঐ যে আশ্রয়হীনা, মাতৃপিতৃহীনা অনাথা কুসুম-কলিকা, ঐ কুসুমকলিকাই দস্যু কৃষকের বাড়ীতে চিন্তামণি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। মাতার আদেশে কুসুম আশ্রয়দাতা ঈশান মণ্ডলকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন। চিন্তামণির জীবনের কতকাংশ আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি, এখন অবশিষ্ট অংশ বিবৃত করিতেছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ইনি একজন সংস্কারক।

চিন্তামণি, আমাদের কুসুমকলিকা. নানা প্রকার কষ্ট যন্ত্রণার হাত অতিক্রম করিয়া সেই অপরিচিত লোকের সহিত যথাসময়ে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। বিহারীলাল কৃপানাথ বাবুর নিকট লিখিয়াছিলেন, আপনি চিন্তামণিকে রাখিবার জন্য সকল প্রকার বন্দোবস্ত করিবেন। এপর্য্যন্তও কৃপানাথ বাবু পরিবার কলিকাতায় আনয়ন করেন নাই, সুতরাং তাঁহার বাসায় চিন্তামণিকে রাখিবার সুবিধা হইল না; দিন কয়েকের জন্য চিন্তামণিকে উমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় রাখিলেন। উমানাথ চট্টোপাধ্যায় এক জন সৎস্বভাবসম্পন্ন ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। উমানাথ বাবু সাধ্যানুসারে চিন্তামণির শিক্ষার সহায়তা করিতে লাগিলেন, চিন্তামণির হৃদয় ও মন ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে লাগিল।

চিন্তামণির কলিকাতা আগমনের এক মাস পরেই কৃপানাথ বাবু আপন পরিবার কলিকাতায় আনয়ন করিলেন, এবং হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি কার্য্যারম্ভ করিলেন। যখন কৃপানাথ বাবুর পরিবার কলিকাতায় আসিলেন, তখন কৃপানাথ বাবু চিন্তামণিকে আপন বাড়ীতে আনিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে ব্রজনাথ বাবু বাড়ী হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া

বিলাতে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। চিন্তামণির সবিশেষ পরিচয় পাইয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রজনাথ বাবু বিহারী লালের সমস্ত বিপদের কথা কৃপানাথ বাবুকে বলিলেন, কৃপানাথ বাবু জমিদারের অত্যাচারের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। ব্রজনাথ বাবুর একান্ত ইচ্ছা স্বত্বেও বিহারীলালের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি যথাসময়ে বিলাত যাত্রা করিলেন। কৃপানাথ বাবুর বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে চিন্তামণি উত্তমরূপে লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের মধ্যে নানা প্রকার নূতন নূতন ভাব প্রবেশ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে লোকেরা যখন সকলে চিন্তামণির বিবাহে প্রবৃত্তি জন্মাইতে প্রবৃত্ত হইল, তখন চিন্তামণির মনে কতকগুলি চিন্তার বিষয় উপস্থিত হইল; সেই চিন্তার সহিত বিহারীলাল তাহারই জন্য কারাবাসী হইয়াছেন, এই ঘটনার স্মৃতি হৃদয়কে ব্যথিত করিতে লাগিল। চিন্তামণি বিবাহ সম্বন্ধে কিছু ধার্য্য করিতে পারিলেন না, কিন্তু অন্তরের মধ্যে বিহারীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের ভাব দিন দিন ঘনীভূত হইতে লাগিল। চিন্তামণি মনে ভাবিলেন, যদি সম্ভবপর হয়, তবে বিহারীলালের কষ্টময় জীবনের সহিত এ জীবন বিনিময় করিব। এই প্রকারে ৪।৫ মাস গত হইতে না হইতে কৃপানাথ বাবু প্রভৃতি চিন্তামণির অজ্ঞাতে তাঁহার জন্য একটী সম্বন্ধ সুস্থির করিলেন। ৩ মাস হইল কলিকাতায় একটী দেশ-সংস্কারক আসিয়াছেন; তাহার সহিত কৃপানাথ বাবুর বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিয়াছে; সেই লোকের সহিত সম্বন্ধ ঠিক করিলেন।

চিন্তামণির কলিকাতায় আগমনের পর ছয় মাসের কিঞ্চিদধিক হইলেই বিহারীলাল কলিকাতায় আগমন করিলেন। কারাবাসে থাকিয়া তাঁহার শরীরের কান্তি মলিন হইয়া গিয়াছে, জীবনের উপরে যেন একটা কালিমার রেখা পড়িয়াছে। কিন্তু বিহারীলাল জীবনের এই কলঙ্ক রেখার জন্য বিন্দু মাত্র সঙ্কুচিত নহেন, কারণ তাঁহার বিশ্বাস পরের উপকারের জন্য আজীবন কারাবাসও পরম সুখের। বিহারীলাল কলিকাতায় আসিয়া কৃপানাথ বাবু ও চিন্তামণির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বিহারীলালকে দেখিয়া চিন্তামণি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন; বিহারী জানিলেন না, কিন্তু কুসুম আপন বক্ষে ঐ চাঁদের সুস্নিগ্ধ জ্যোতি আবদ্ধ করিবার জন্য লালায়িত হইলেন।

বিহারীলাল কলিকাতায় আসিয়া আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলের নিকট বাঙ্গালার জমিদারের অত্যাচার ও কৃষকশ্রেণীর দুরবস্থার কথা বলিতে লাগিলেন। সকলের হৃদয়ে বিষয়টী এতদূর আঘাত করিল যে, সকলেই প্রজাবর্গের পক্ষ সমর্থন ও সাধারণের উন্নতি সাধন করিবার জন্য কলিকাতায় একটী সভা সংস্থাপন করিতে সম্মত হইলেন। কৃপানাথ বাবু ও বিহারীলাল উভয়েই প্রাণপণ করিয়া সভা স্থাপনের আয়োজনে কৃতসংকল্প হইলেন ; এবং চতুর্দ্দিক হইতে আরো শত শত লোক এই সাময়িক আন্দোলনে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে অগ্রসর হইলেন। কৃপানাথ বাবু এখন সাহেবের বেশ ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু হৃদয় মন এখনও স্বদেশের উন্নতির জন্য ব্যাকুল। তিনি সাহেবের বেশ ভূষা ও বাঙ্গালীর হৃদয় লইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

বাল্যকালে বিজয়গোবিন্দ বিহারীলালের সহিত এক শ্রেণীতে পড়িতেন, সেই সময় হইতে উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। বিহারীলাল কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া বিজয়গোবিন্দের ভগ্নীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। বিজয়গোবিন্দের ভগ্নীকে উদ্ধার করা বিহারীর জীবনের একটী কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল।

উপরে যে সংস্কারকের কথা বলা হইল, বিহারীলাল দেখিয়াই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। মানব জীবনের পরিবর্ত্তন যতই বিস্ময়জনক হউক না কেন, বিহারীলাল কপটতা-আভরণ-আবৃত সংস্কারকের হৃদয় মনের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন। বিহারীর মনে সন্দেহের বিষম আন্দোলন চলিতে লাগিল। বাহিরে কৃপানাথ বাবু প্রভৃতি ইঁহার প্রতি যে প্রকার শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, সে সম্বন্ধে তিনি নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। বিহারীর দৃঢ় সংস্কার ছিল, একজন অপকৃষ্ট লোকের দ্বারাও যদি দেশের মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তবে তাহাতে বাধা দেওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ মানুষের জীবন কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে উন্নতির মার্গে আরোহণ করে, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। ঐ সংস্কারক কেবল বিহারীর নিকট অবনত মস্তকে থাকিতেন, কিন্তু আর সর্ব্বত্র সমান অধিকার পাইতেন। কৃপানাথ বাবু মনুষ্য-চরিত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তিনি নির্ম্মল ভালবাসার বিনিময়ে ঐ বিষম গরল-পূর্ণ সংস্কারকের কপট ভালবাসা ক্রয় করিলেন। তাহার উন্নতি-সাধন কৃপানাথ বাবুর একটী প্রধান কার্য্য হইল।

কৃপানাথ বাবু প্রভৃতি এই ব্যক্তির হস্তে চিন্তামণিকে উৎসর্গ করিতে

কৃতসংকল্প হইয়াছেন, ইহা ক্রমে ক্রমে বিহারীলাল জানিতে পারিলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে প্রথমে চিন্তামণি ভাল রকম চিনিতে পারেন নাই। বাহিরের আচ্ছাদন মানুষকে কত সময়ে রক্ষা করিয়া থাকে!! কৃপানাথ বাবুকে এ বিষয়ে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ জানিয়া বিহারীলাল একটু ভীত হইলেন, কিন্তু মনে ধারণা ছিল, সময়ে সকলি কৃপানাথ বাবু বুঝিতে পারিবেন। আচ্ছাদন আর কদিন জগতের চক্ষুকে ফাঁকী দিতে পারে? মেকি টাকা ক দিন চলে? বিহারী মনে মনে বুঝিলেন, হয় আজ, নয় দশ দিন পর, কৃপানাথ বাবু অবশ্য এই "গোময়পরিপূর্ণ মধুর ভাণ্ডার" চিনিয়া লইতে পারিবেন। তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল, একান্তই যদি কৃপানাথ বাবু ইঁহাকে না চিনিতে পারেন, তবে উপযুক্ত সময়ে ইহার প্রতিবিধান করিতে পারিব। ইহা ভাবিয়া বিহারী এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত রহিলেন। এদিকে অনেক ব্যক্তি এ বিবাহে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল,—অনেক ব্যক্তি আনন্দ এবং উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। ভণ্ড-সংস্কারকের বুক আনন্দে দশগুণ ফুলিয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কুসুম ফুটিল।

বিহারীর বৃদ্ধ খুল্লতাত প্রভৃতি অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইবেন, আশঙ্কায়, বিহারীলাল যতদিন তিনি কারাগারে ছিলেন, ততদিন আর বাড়ীতে পত্রাদি লেখেন নাই। এবার কলিকাতা আসিয়া অনেকদিন পর বাড়ীতে পত্র প্রেরণ করিলেন। বিহারীর বাড়ীর আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলই কারামুক্তির সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বিহারীর কলিকাতার বাসা খরচ প্রভৃতি রীতিমত বাড়ী হইতে আসিতে লাগিল। বিহারী খরচের টাকা হইতে কতক বাঁচাইয়া চিন্তামণির অভাব দূর করিতে লাগিলেন, এবং অকুলন পড়িলে গোপনে ভিক্ষা করিয়া চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বিজয়গোবিন্দের ভগ্নীর জন্য অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়াছেন,তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া রীতিমত স্কুলে পড়াইবেন সংকল্প করিলেন। বিজয়ের ভগ্নীকে কলিকাতায় আনিলে, তাহাদের খরচ চালাইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া

বড়ই চিন্তিত হইলেন। কৃপানাথ বাবু প্রভৃতি চিন্তামণির বিবাহের যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে বিহারী হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইয়াছেন। বিজয়ের ভগ্নীকে আনিয়া যত কষ্টেই পড়িতে হউক না কেন, কৃপানাথ বাবুদের সংশ্রবে রাখিবেন না, স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন।

শিক্ষা ও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কুসুমের হৃদয়ে প্রেম-কলিকা ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। মাতৃহীনা অনাথা কুসুম প্রস্ফুটিত হইতেছে, হায়, এ চিত্র দেখিয়া কে সুখী হইবে? মেঘনার সলিলে যে কুসুম এক দিন ডুবিয়া মরিতে বাসনা করিয়াছিলেন, আজ সেই কুসুম কত সৌন্দর্য্যে ফুটিয়াছেন! কুসুমের মনে মেঘনার আহ্বান আজও মধুময় বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু মাতার আদেশ তিনি দিন দিন বিস্মৃত হইতেছেন। বালিকা কুসুমের প্রেম-কলিকা প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল যখন, বালিকা তখন উন্মত্ত হইয়া উঠিল, মাতার মধুমাখা উপদেশ বাক্য তখন যেন কর্কশ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কুসুমের প্রস্ফুটিত প্রেম আর সকল কথা ভুলিয়া বিহারীলালের পানে ধাবিত হইল। বিহারীও কোমল শিশুর ন্যায় ঐ কুসুমের প্রেমে আকৃষ্ট হইলেন।

দেখিতে দেখিতে কুসুম ও বিহারী, উভয়ের হৃদয়ের গতি পরিবর্ত্তিত হইল, উভয়ে উভয়ের প্রেমে মুগ্ধ হইলেন। পূর্ব্বে বিহারীলাল চিন্তামণিকে যে ভাবে দেখিতেন, তাহা রূপান্তরিত হইল। আর চিন্তামণি যে ভাবে দেখিতেন, তাহাও রূপান্তরিত হইল। চিন্তামণি এখন যেন কুসুম হইয়া প্রেম-বৃন্তকে উজ্জ্বল করিতেছেন। কিন্তু উভয়ের মনোভাব এ পর্য্যন্ত উভয়ের নিকট ব্যক্ত হয় নাই। কি আশ্চর্য্য! ভালবাসার মধ্যে আবার লজ্জা? প্রেমের মধ্যে আবার কপটতা? কি আশ্চর্য্য! হৃদয়ের মধ্যে আবার আবরণ! কুসুম বিহারীকে হৃদয় মন অর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু স্বীয় অবস্থা স্মরণে বিহারীর নিকট কিছুই ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না, যদি বিহারী এ দান তুচ্ছ করে! আর বিহারী কি ভাবেন? বিহারী ভাবেন—আমি চিন্তামণিকে এ প্রকার ভাবে ভালবাসি, ইহা চিন্তামণি জানিলে যদি আমাকে ধিক্কার দেয়; যদি বলে পুরুষ কি স্বার্থপর!! চিন্তামণি যে কুসুম হইয়া বিহারীর প্রেমবৃন্তে শোভা পাইতেছেন, তাহা বিহারী ভাবিতে পারিতেছেন না। বিহারী এই মধুর ভালবাসার কল্পনায় কত বিভীষিকা দেখিয়া বালকের ন্যায় অস্থির হইতেছেন।

অনুরাগের প্রথম পরিচ্ছেদ কিছুদিন পরেই শেষ হইল। কুসুম একদিন বিহারীলালের মনের কথা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন;—বিহারী বাবু, আপনি আমার জন্য কেন বৃথা এত কষ্ট সহ্য করিতেছেন? আমার জীবনের কিছুই উন্নতি হলো না!

বিহারীলাল গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—এ কথা বলিতেছ কেন? তোমার মনে কি জন্য কষ্ট হতেছে? আমার কোন ব্যবহারে?

কুসুম।—আমি বুঝ্‌তে পার্‌তেছি, আমি আপনার ভালবাসার অযোগ্য, কারণ আমার পূর্ব্ব জীবন অত্যন্ত ঘৃণিত।

বিহারী।—এ সবই তোমার কল্পনা। তোমার পূর্ব্ব জীবনে কি আছে, কিছুই জানি না, জানিতে বাসনাও রাখি না, কারণ একবার যখন তোমাকে ভালবেসেছি, তখন তোমার পূর্ব্ব জীবনের কোন ঘৃণিত কার্য্যই এ ভালবাসা ছিন্ন করিতে পারিবে না। ভালবেসেছি ত বেসেছি।

কুসুম।—আপনি আমাকে ভালবাসেন কেন? এ ঘৃণিত জীবনে এমন কি আছে, যাকে ভালবাস্‌তে পারেন?

বিহারী।—তোমার হৃদয় আছে, ইহাকেই ভালবাস্‌তে পারি, তুমি আর কিসের কথা বল? মানুষের হৃদয় ভিন্ন আর কি ভালবাসার জিনিস আছে? তোমার হৃদয়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যেই আমি মোহিত হয়েছি।

কুসুম।—তাত বুঝিলাম, কৃপানাথ বাবু আমার বিবাহের যে পাত্র ঠিক করেছেন, সে সম্বন্ধে আপনার মত কি?

বিহারী।—মত তোমার। আমার মতামত কি?

কুসুম অত্যন্ত ভাবনার মধ্যে পড়িলেন, স্পষ্ট কিছুই জানিতে না পারিয়া মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছে, অথচ বিহারীলাল যে প্রকার গম্ভীর ভাবে উত্তর দিতেছেন, তাতে কিছুই স্পষ্ট জানা যাইতেছে না। অনেক ভাবিয়া বলিলেন,—আমি বেশ বুঝিতেছি, আমার পক্ষে বিবাহ করা উচিত, বয়সও অধিক হইল, সুতরাং মনে করিতেছি, উহাতেই সায় দি।

বিহারীর অন্তরে দারুণ শেল বিদ্ধ হইল, নম্র ভাবে বলিলেন, স্ত্রীলোক সব পারে? কেবল তুমি কেন, তোমার জাতের সকলেই এরূপ পারে!

বিহারীর এই কথা শুনিয়া কুসুমের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, কম্পিত ওষ্ঠে বলিলেন, মিথ্যা কথা।

এ কথার পরে বিহারী আর কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেন না, তিনি

সে স্থান হইতে উঠিয়া আসিলেন। কিন্তু কুসুমের নীরব ভালবাসা যেন বিহারীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। অনুরাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রতিকূলে।

এই সময় হইতে চিন্তামণির বিবাহ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের ঘটনাগুলি সংক্ষেপে এ অধ্যায়ে বর্ণনা করিব।

গিরিবালাকে কলিকাতায় আনয়ন করিবার জন্য, বিহারীলাল, বিজয়-গোবিন্দকে গ্রীষ্মের বন্ধের সময় বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। বিজয়গোবিন্দ অনেক প্রকার কৌশল করিয়া গিরিবালাকে গোপনে লইয়া কলিকাতা আগমন করিলেন। উমানাথ চট্টোপাধ্যায় এ সময়ে প্রকৃত বন্ধুৰ কার্য্য করেন; গিরিবালাকে আপন বাড়ীতে আশ্রয় প্রদান করিয়া যথেষ্ট সাহায্য করেন। গিরিবালার জন্য বিজয়গোবিন্দকে অনেক প্রকার বিপদে পড়িতে হয়, প্রথমতঃ মকর্দ্দমা উঠিবার উপক্রম হয়, কিন্তু বিজয়ের পিতা অনেক ভাবিয়া তাহা হইতে বিরত থাকেন। কিন্তু এই সময় হইতে বিজয়ের মাতুল বিজয়ের পড়ার খরচ বন্ধ করিয়া দেন। বিহারীলাল, বাড়ী হইতে আপন খরচের জন্য যাহা পাইতেন, তদ্দ্বারা অতি কষ্টে গিরিবালা, বিজয় ও বিহারীর খরচ চলিতে লাগিল। উমানাথ বাবু কৃপানাথ বাবুর অধীনে মাত্র ২০৲ টাকা বেতনে একটী সামান্য কার্য্য করিতেন, তদ্দ্বারা অন্যের সাহায্য করা দূরে থাকুক, আপনার খরচও ভালরূপ চলিত না। এ দিকে কুসুম বিহারীর প্রেম-ভিখারিণী হইয়া সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছেন, কিন্তু বিহারী কি করিবেন, বুঝিতে পারিতেছেন না। বাড়ী হইতে আর অধিক টাকা আনিতে পারেন না, কারণ বাড়ী হইতে যাহা আসিত, তাহা এক জনের পক্ষে যথেষ্ট। বিহারী অগত্যা ত্রিশ টাকা বেতনে একটী চাকুরী গ্রহণ করিলেন। এই প্রকার করিয়া দুই বৎসর গত হইল। সেই সংস্কারক দিন দিন কৃপানাথ বাবুর হৃদয়ে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, চিন্তামণির সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে, ইহা কৃপানাথ বাবু একপ্রকার ঠিক করিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে ব্রজনাথ বাবু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেন; তিনি

প্রথমে আসিয়াই যে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, সে কার্য্যে তিনি সুযশ পাইলেন না। বাঙ্গালীদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে সকলের অপ্রিয় হইলেন। তিন বৎসর কর্ম্ম করিতে না করিতেই তাঁহার নামে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ উঠিল, সেই অভিযোগে তিনি পদচ্যুত হইলেন। তাহার পদচ্যুতির পর কৃপানাথ বাবু অন্তরে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন এবং অচিরে কল্পিত সভাটী স্থাপন করিয়া দেশহিতব্রত গ্রহণ করিলেন। ব্রজনাথ বাবু এই সভার উন্নতির নিমিত্ত প্রাণ মন উৎসর্গ করিলেন। কৃপানাথ বাবুর অনুরোধে বিহারীলাল আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই সভার কার্য্যে ৪০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। বিহারী বাবু কৃপানাথ বাবু ও ব্রজনাথ বাবু সকলেই প্রাণপণে এই সভার উন্নতি সাধনে রত হইলেন। বলা বাহুল্য, দুই এক বৎসরের মধ্যে এই সভা দেশে মহা যশ পাইল; শিক্ষিত শ্রেণীর প্রায় অধিকাংশ লোক ইহাকে দেশের একটী মঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া গণনা করিলেন। সেই জমিদার সংস্কারক এই সভায় দশ সহস্র টাকা দান করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। টাকার জোরে কলিকাতার দুর্বৃত্ত ভণ্ড সংস্কারকও বিশেষ সুখ্যাতি পাইল।

বিহারীলাল এই সময়ে কৃপানাথ বাবুকে জীবনের বিশেষ বন্ধু বলিয়া বুঝিলেন। চক্রান্তশীল জগতে কাহার মনে কোন্ চিন্তা উপস্থিত হইয়া কার্য্যপথে চালায়, তাহা কে বুঝিতে পারে? এই সময়ে হঠাৎ কৃপানাথ বাবু উমানাথ বাবুকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। বিহারীলাল এই ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন। কৃপানাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন— উমানাথ বাবু নিতান্ত অকর্ম্মণ্য লোক। এক দিন বিহারীলাল কৃপানাথ বাবুর মুখেই উমানাথের যথেষ্ট প্রশংসা শুনিয়াছিলেন, তিনি হঠাৎ মত পরিবর্ত্তনের কিছুই কারণ বুঝিতে পারিলেন না। কৃপানাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করায় ভাল উত্তর পাইলেন না। উমানাথ বাবুর কর্ম্ম গেলে তিনি আর কলিকাতায় থাকিতে পারিলেন না, তিনি ঢাকায় রওনা হইলেন; সুতরাং গিরিবালাকে অগত্যা কৃপানাথ বাবুর আশ্রয়েই রাখিতে হইল। অভিসন্ধির জাল আরো বিস্তৃত হইল,—মনোরথ পূর্ণ হইল।

গিরিবালা যখন কৃপানাথ বাবুর বাসায় আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন, সেই সময় হইতে ব্রজনাথ বাবু কুটিল চক্ষে এই বালিকার পানে তাকাইতে আরম্ভ করি-

লেন। গিরিবালা তখনও বালিকা, ভাল মন্দ কিছুই বুঝে না। গিরিবালা সকলকে আপন জ্ঞান করে, সকলের সহিতই সমান ভাবে সরল ভাবে ব্যবহার করে। ব্রজনাথ বাবু এই বালিকার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইরা ইহাকে জীবন-সঙ্গী করিবেন, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন। লোকে বলে, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে যখন গিরিবালা ছিল, তখন ব্রজনাথ বাবুর মন তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল এবং গিরিকে আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যেই কৃপানাথ বাবুর পরামর্শে উমানাথ বাবুকে কর্ম্ম হইতে বরতরফ করা হয়। কারণ কৃপানাথ বাবু জানিতেন, উমানাথের কর্ম্ম না থাকিলে নিশ্চয় গিরিবালাকে তাহাদের আশ্রয়ে রাখিতে হইবে। যাহা হউক, বিহারী এসকল কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি কৃপানাথ বাবুকে বিশেষ আত্মীয় জ্ঞানে কুসুমকে এবং অবশেষে গিরিকে তাঁহার বাসায় রাখিলেন। এই সময়ে বিহারীর মনে বেশ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, কৃপানাথ বাবুকে নিষেধ করিলে কখনও তিনি চিন্তামণিকে ঐ ভণ্ড সংস্কারকের হস্তে সমর্পণ করিবেন না। কৃপানাথ বাবু বিহারীর নিকট এসম্বন্ধে হৃদয়ের ভাব গোপন করিলেন। ঐ সংস্কারক এবং কৃপানাথ বাবু, উভয়েই চিন্তামণি সম্বন্ধে বিহারীকে সর্পের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা মনের কথা অতি গোপনে লুকাইয়া রাখিলেন। বিহারী বিশ্বাস চক্ষে কৃপানাথ বাবুকে দেখিতে লাগিলেন, সুতরাং তাহার অন্তরের স্তরে স্তরে যে গরল লুক্কায়িত রহিল, তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিলেন না।

আর একটী ঘটনা এই সময়ে বিহারীর বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করিল। তিনি দেখিলেন, ব্রজনাথ বাবু যদৃচ্ছাক্রমে সভার অর্থ নিজ কার্য্যে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি প্রথম হইতে ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ আরম্ভ করেন, সুতরাং ব্রজনাথ বাবু বিহারীর প্রতি আন্তরিক বিরক্ত হইলেন, এবং মনে মনে বিহারীকে এই সভা হইতে অপসৃত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু এ কার্য্যে সহসা কৃতকার্য্য হওয়া দুরূহ ব্যাপার; কারণ ব্রজনাথ বাবু জানিতেন, একমাত্র বিহারীর যত্নেই সভার আভ্যন্তরীণ অবস্থা দিন দিন উন্নত হইতেছে। কিন্তু ব্রজনাথের হৃদয়ের প্রতিজ্ঞা বাহিরের কোন প্রকার চিন্তাতেই পরিবর্ত্তিত হইল না।

যখন বিহারী সভার কার্য্যে বিশেষ যশ লাভ করিলেন, তখন কেহ কেহ তলে তলে হিংসার বাণ চালাইতে লাগিলেন। অনেকে গোপনে কৃপানাথ

বাবুকে বলিল, বিহারী অপেক্ষা অনেক ভাল লোক ঐ বেতনে পাওয়া যায়। কৃপানাথ বাবু প্রথমে এ সকল কথায় কর্ণপাতও করিলেন না; কিন্তু পরে ব্রজনাথ বাবু যখন বলিলেন,—"দাদা, আমার যশ মান বুঝি আর বজায় থাকে না; কারণ বিহারী বাবুকেই সকলে অধিক মান্য করে," তখন কৃপানাথ বাবুর চিত্ত এই দিকে একটু আকৃষ্ট হইল।

এই সময়ে আর একটী ঘটনা হইল। বিহারীলাল কলিকাতাতেই থাকিতে সংকল্প করিয়াছেন, ইহা জানিয়া বিহারীর অন্যতর খুল্লতাত মহাশয় কলিকাতায় একটী সুন্দর বাড়ী ক্রয় করিয়া দিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, বিহারীর মন সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে সমস্ত সম্পত্তি তাহাদের হাতে থাকিবে, এবং সময়ে বিহারীর বিবাহে প্রবৃত্তি জন্মিবে। এই দুটী আশায় বুক বাঁধিয়া তাঁহারা কলিকাতায় একটী সুন্দর বাড়ী ক্রয় করিয়া ব্যবহারোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দিলেন। এই ঘটনাটীও অনেকের চক্ষে শূলসম হইল। বিহারীর অবস্থা ক্রমে ভাল হইতেছে, ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোকের মন হিংসায় পরিপূর্ণ হইল;—"সামান্য স্কুলের ড্যাক্‌রা ছেলেটার অবস্থা এত ভাল হলো" ইহাতে সকলে অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন। এমন কি, ব্রাহ্মসমাজের বড় বড় প্রচারকদেরও মনে নানা কুচিন্তা ও হিংসা বিদ্বেষ ঢুকিল।

বিহারীর বাড়ী ঘর প্রস্তুত হইল পর কুসুম মনে করিলেন, এই বার জীবনের কষ্ট দূর হইবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালারও সুখের দিন উপস্থিত হইবে। কুসুম এই কয়েক দিন জীবনে যে সুখ পাইলেন, জীবনে কখনও তেমন নির্ম্মল সুখ ঘটে নাই।

বিহারীর কার্য্যের প্রতি অসাক্ষাতে কৃপানাথ বাবু প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে একটু একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সাক্ষাতে কেহই কিছু বলেন না; বিহারী ইহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। তিনি সকলের কথাকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আপন কর্ত্তব্য পালনে রত হইলেন, এবং সভার প্রতি সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে মফঃস্বলে যাত্রা করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

এতদিনে কুসুম ডুবিল!

বিহারীলালের কলিকাতা পরিত্যাগের কিয়দ্দিবস পরেই ভিতরে ভিতরে চিন্তামণির বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। বিবাহ যাহাতে সত্বর হয়, কৃপানাথ বাবু এবং ব্রজনাথ বাবু উভয়ে মিলিয়া তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। বিজয়গোবিন্দ এ বৎসর অনর পরীক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত, বিহারী মফঃস্বলে, এই সুযোগে চিন্তামণির বিবাহ দিতে উভয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সংস্কারক কে, তাহা চিন্তামণি আজও জানিতে পারেন নাই, বিহারী জানিতে পারিয়াও চিন্তামণিকে বলেন নাই। পাঠকগণও বোধ করি ঐ মহাত্মাকে চিনিতে পারেন নাই? ঐ মহাত্মার নাম ভবানীকান্ত রায়। ঈশানের মকর্দ্দমার শেষ ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ জ্ঞাত হইয়াছেন, ঐ মকর্দ্দমার পর চিন্তামণি হাতছাড়া হইল দেখিয়া ভবানীকান্ত রায় একেবারে অধীর হইলেন। ডেপুটী মাজেষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আন্দোলন করা ভবানীকান্তের দ্বারা হইল না। তিনি গোপনে চিন্তামণিকে আত্মসাৎ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে ভবানীকান্ত বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলেন, চিন্তামণি কলিকাতায় গমন করিয়াছে। এই সন্ধান পাইয়া ভবানীকান্ত বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে কলিকাতায় পৌঁছিলেন, এবং গোপনে নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, চিন্তামণি কৃপানাথ বাবুর বাসায় আছে। পাঠক অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন, দুর্ব্বৃত্ত ভবানীকান্ত চিন্তামণির জন্য এক প্রকার উন্মত্ত হইয়াছেন। চিন্তামণি যে স্থানে রহিয়াছেন, এস্থান হইতে উদ্ধার করা সামান্য ব্যাপার নহে। প্রথমে ভবানীকান্ত গোপনে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই যখন অভিলাষ পূর্ণ হইল না, তখন কৃপানাথ বাবুর সহিত পরিচিত হইলেন; এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতায় অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কারক নাম ক্রয় করিলেন। কৃপানাথ বাবু ভবানীকান্তের চক্রান্তে ভুলিয়া অনাথা চিন্তামণিকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন। দুর্ব্বৃত্ত ভবানীকান্ত মনে মনে আহ্লাদে নৃত্য করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন,—

ইহাদের ন্যায় নিরেট বোকা আর কোথাও নাই। গোপনে বিবাহের সমস্ত ঠিক হইল ; চিন্তামণি বিবাহের দিন পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই ; বিবাহের সমস্ত আয়োজন গোপনে অন্য একটী বাসায় হইতেছিল। বিবাহের দিন অপরাহ্নে চিন্তামণিকে কৃপানাথ বাবু বলিলেন ;—"কুসুম, আজ তোমার বিয়ে হবে, আজ বড় আনন্দের দিন।"

কুসুমকলিকা এ কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন, বলিলেন, সে কি ? আমার বিয়ে আর আমি কিছুই জানিনে ? কোথায় বে হবে ?

কৃপানাথ বাবু সস্নেহে বলিলেন, জানিবার দরকার কি ? আমরাই তোমার হয়ে সব বন্দোবস্ত করেছি। তোমার অপেক্ষাও তোমার সুখ দুঃখের জন্য আমাদিগকে অধিক দায়ী মনে করি।

কুসুম।—তা ত ঠিক ! কিন্তু আমার বে হবে, আর আমার মতও একবার জিজ্ঞাসা কল্লেন না ? এ কি প্রকার ?

কৃপানাথ।—তুমি অবলা, তোমার আবার মতামত কি ?

কুসুম বলিলেন, তা বেশ ! আমাকে নিতান্ত সামান্য জ্ঞান কর্‌বেন না ; আমি আপনার আশ্রয়ে আছি বলে আমার দ্বারা যা ইচ্ছা তাই কর্‌তে পার্‌বেন, ভাব্‌বেন না।

কৃপানাথ বাবু দেখিলেন, কুসুমের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ; তিনি আর কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কুসুমের আর মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিবার সময় নাই ; মনে করিতেছেন, এক বার বিজয়গোবিন্দ বাবুকে সংবাদ দি, কিন্তু কে সংবাদ লইয়া যাইবে ? আজ কুসুম প্রকৃত কারাবাসিনী ; একবার ভাবিতেছেন, বিহারীবাবুর নিকট টেলিগ্রাম পাঠাই, কিন্তু তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভবে ? কে টেলিগ্রাম করিবে ? হায় হায় কুসুম, তবে আর উপায় নাই ! মেঘনার গর্ভ কি রমণীয় স্থান ! কেন কুসুম উহার মমতা ছাড়িলে ? কেন জলে ডুবিয়া আবার উঠিলে ? তোমার ভাগ্যেও কি এই ছিল ! দুর্ব্বৃত্ত পশুই তোমার পরিণাম হলো ! হায় হায়, কুসুম এখনও আছ ? কি সাধে আছ ? কোন্ আশায় আছ ? দিন ত যায়, কি ভাবিতেছ ? দিন ত যায়, তোমার মাতার কথা ত বৃথা হয় ! তবে বিহারীর মমতা ভুলিয়া যাও, ইহকালে বিহারীর সহিত আর তোমার মিলনের সম্ভাবনা নাই ! এ দারুণ সংবাদ তোমার প্রাণে বাজিতেছে, কিন্তু কি করিবে বল ? যাহা সত্য, তাহা কি প্রকারে অপ্রচ্ছন্ন থাকিবে !

কুসুমকলিকা আর উপায় দেখিলেন না, ক্রমে ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল, তিনি আস্তে আস্তে শরীরের সকল আভরণ একে একে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বিহারীর আশাই যদি জীবনে পরিত্যাগ করিতে হইল, তবে আর এ সকলে কাজ কি? কুসুম ভাল পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে সকল বাসনা, সকল আসক্তি পরিত্যাগ করিলেন। একমাত্র ধর্ম্মের ভয়ে তিনি আত্মঘাতিনী হইতে পারিলেন না, কিন্তু জীবনের আর সকল সুখের বাসনাকে বিসর্জ্জন দিলেন। তারপর ভাবিতে ভাবিতে অচেতন হইয়া মৃতবৎ গৃহের মধ্যে পড়িয়া রহিলেন।

কুসুমের এই অবস্থা দেখিয়াও কাহার দয়া হইল না। যে অবস্থা দেখিলে পাষাণ পর্য্যন্ত গলিয়া যায়, সেই অবস্থায় কৃপানাথ বাবু কুসুমকে দুর্ব্বৃত্ত ভবানীকে সম্প্রদান করিলেন। লোকেরা হাসিল, নাচিল, গাইল। ব্রাহ্ম-পুরোহিত আহ্লাদে মন্ত্র উচ্চারণ করিল; আনন্দের উচ্চরোলে একটী অবলার জীবন-সুখ চিরকালের জন্য বিসর্জ্জিত হইল। অহঙ্কারের মত্ততায় কৃপানাথ বাবু সভ্যতা ও সংস্কারের নামে ঘোরতর কলঙ্ক আরোপ করিলেন। একবারও ভাবিলেন না যে,তিনি এই কার্য্যের দ্বারা দেশের কি মহা অনিষ্টের সূত্রপাত করিলেন। এতদিনে মাতৃপিতৃহীনা আশ্রয়-শূন্যা কুসুমকলিকা নরকের অগাধ সলিলে নিক্ষিপ্ত হইলেন, চিরকালের জন্য ডুবিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভিখারী বা স্বাধীন জীব?

কৃপানাথ বাবু একজন ধার্ম্মিক, বিবেচক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি এই প্রকার গর্হিত কার্য্য কেন করিলেন? বাহিরের লোকেরা বুঝিল, ভবানী-কান্তের প্রতি কৃপানাথ বাবুর প্রগাঢ় শ্রদ্ধাই এই বিবাহের মূল; কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন, বিহারীলাল ও চিন্তামণির গভীর প্রণয়ের ভাব কৃপানাথ বাবু উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন; এই সম্ভাবিত বিবাহের মূলে কুঠারাঘাত করাই এই কার্য্যের প্রধান কারণ। ইহারই বা কারণ কি, তাহা কেহই নিরূপণ করিতে পারিলেন না। নির্ম্মল গভীর ভালবাসার পরিণাম বিবাহ, ইহা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু কৃপা-

নাথ বাবু কেন এই ভালবাসার পরিণামের মূল উচ্ছেদ করিলেন ? এই নিগূঢ় তত্ত্ব কেহই ভেদ করিতে সক্ষম হইল না।

যাহা হউক, কৃপানাথ বাবু মনে করিয়াছিলেন, বিবাহের পর নিশ্চয় ভবানীকান্ত ও চিন্তামণির মধ্যে ভালবাসা জন্মিবে ; কিন্তু বিবাহের পর নানা ব্যবহারে কৃপানাথ বাবু উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন, সে আশা ফলপ্রদ হইবে না। কৃপানাথ বাবু বিবাহের পর সাধ্যানুসারে চিন্তামণিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টায় কোন সুফল ফলিল না। কৃপানাথ বাবু বুঝিলেন, চিন্তামণির হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে দুঃখানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা স্বামী স্ত্রী উভয়েরই জীবনের সুখ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে। কি করিবেন, বাহিরে একথা কাহাকেও বলিতে পারেন না, তিনি চিন্তামণির দুঃখ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন।

বাস্তবিক তাহাই হইল। চিন্তামণির বিবাহের পরদিন হইতে আর কখন ইহার মুখ প্রসন্ন হয় নাই, মুখে হাসি ফুটে নাই। চিন্তামণি বিবাহের পরদিন হইতে ইচ্ছা করিয়াই ভবানীকান্তের সংসারের সকল কার্য্য নিজ হস্তে করিতেন, কিন্তু ভুলিয়াও একদিন কাহারও সহিত কোন প্রকার কথা বার্ত্তা বলিতেন না ; মলিনবেশে মলিনভাবে তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন। আহার না করিলে লোক বাঁচিতে পারে না, তাই কখন কখন আহার করিতেন, কিন্তু প্রায়ই উপবাস থাকিতেন। মাথায় প্রায় তৈল ব্যবহার করিতেন না, চুল কখনও বাঁধিতেন না। কাহারও সহিত প্রায় দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না। এই প্রকারে চিন্তামণি ভবানীকান্তের গৃহে একটী প্রকৃত বিষাদের চিত্র হইয়া রহিলেন।

ভবানীকান্ত রায় প্রথমে কত প্রকার সুখস্বপ্ন দেখিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের পর ক্রমে ক্রমে সে সকল সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। প্রথমে দুর্ব্বৃত্ত ভবানীকান্ত মনে করিয়াছিলেন, ভয় দেখাইয়া বা বলপূর্ব্বক রিপু চরিতার্থ করিয়া চিন্তামণির ভালবাসা আকর্ষণ করিব, মনে করিয়াছিলেন, বলপূর্ব্বক আপন অভিলাষ পূর্ণ করিব, কিন্তু হায় কিছুদিন পরে সে সকলি বৃথা হইল। চিন্তামণি একদিন স্পষ্ট বলিলেন, তুমি যে দিন আমার মতের বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিবে, সেই দিন নিশ্চয় আত্মঘাতী হয়ে মরব। একথা শুনিয়া এবং চিন্তামণিকে নিতান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া ক্রমে ভবানীকান্ত বল-

প্রয়োগ বা ভয়প্রদর্শনে যে কিছু করিতে পারিবেন, সে আশা পরিত্যাগ করিলেন; মনে ভাবিলেন, যাহা করিয়াছি, তাহা করিয়াছি, স্ত্রী-হত্যা করিয়া আর সংস্কারকদিগের নামে কলঙ্ক আরোপ করিয়া কি করিব? কাজেই তিনিও চিন্তামণির দুঃখে হৃদয়ে আঘাত পাইলেন।

বিহারীলাল যথাসময়ে চিন্তামণির বিপদের সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন,; তাহার হৃদয় মন কি প্রকার অস্থির হইল, তাহা আমাদের লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। বিহারী চিন্তামণির জন্য জীবনে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সংসারে আর কেহই জানে না; কলিকাতায় নামতঃ চিন্তামণি কৃপানাথ বাবুর আশ্রয়ে থাকিতেন, কিন্তু প্রায় সমস্ত খরচ বিহারীকে চালাইতে হইত; কখন কখন এ জন্য বিহারীকে অতি ঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তি পর্য্যন্ত অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তারপর যে চিন্তামণির জন্য বিহারী অনেক দিন কারাবাসে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই চিন্তামণির এইরূপ পরিণাম বিহারীর হৃদয়ে কি আন্দোলন উপস্থিত করিল, তাহা আমরা ব্যক্ত করিতে অক্ষম। বিহারী ভণ্ডসংস্কারক কৃপানাথ বাবু প্রভৃতির প্রতি আন্তরিক বিরক্ত হইলেন। সেই সময়েই সভার কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন, ভাবিলেন, কিন্তু বিহারী ধৈর্য্যশীল ও বিবেচক ব্যক্তি, মনে করিলেন, ইহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া দেশের কর্ত্তব্য পালনে কেন ক্ষান্ত থাকিব? আরো ভাবিলেন,সভাটীর দ্বারা প্রকৃত পক্ষে দেশের অনেক প্রকার মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। এই সকল ভাবিয়া তিনি আপাতত সভার কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন না; মনে ভাবিলেন, ইহাদিগের স্বভাব চরিত্র আরো পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। কিন্তু এই সময়ে মনে একটী জটিল প্রশ্ন উপস্থিত হইল,—এই ঘটনার পরেও কি আর গিরিবালাকে কৃপানাথ বাবুর বাসায় রাখা সঙ্গত? গিরিবালার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলেন, তাহার আর এক মুহূর্ত্ত উহাদের সংসর্গে থাকিতে বাসনা নাই, কিন্তু কি করিবেন, ইহাই চিন্তার বিষয় হইল। বিজয়ের কলেজ-শিক্ষা একপ্রকার শেষ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত কোন কর্ম্ম না হয়, সে পর্য্যন্ত কোথায় রাখা যায়? বিশেষতঃ বিজয় ভবিষ্যতে কি করিবেন, তাহা আজ পর্য্যন্তও ঠিক করিতে পারেন নাই। বিজয়গোবিন্দ ও বিহারী অনেক আলোচনার পর আপাততঃ কৃপানাথ বাবুর আশ্রয়ে গিরিকে রাখাই উচিত, মনে স্থির করিলেন, এবং সমস্ত মনের কথা তাহারা উভয়ে কৃপানাথ বাবুর নিকট বিশেষ করিয়া বলিলে কৃপানাথ বাবু গত কার্য্যের জন্য ক্ষমা

প্রার্থনা করিলেন। বিহারী ও বিজয় মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, ইহারা কৃপানাথ বাবুর অমায়িক ভাবে মুগ্ধ হইলেন।

এই প্রকার অবস্থায় কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল; বিহারীলাল প্রাণপণ করিয়া সভার উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে সভার দ্বারা দেশের অনেক উপকার সাধন লরিলেন।

ক্রমে ক্রমে অনেক বিষয়ে কৃপানাথ বাবু ও ব্রজনাথ বাবুর দুরভিসন্ধি বিহারীর হৃদ্বোধ হইতে লাগিল। সভাটীকে ব্রজনাথ বাবু নিজের সম্পত্তি করিবার চেষ্টায় রত হইয়াছেন দেখিয়া তিনি অন্তরে অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন। টাকা কড়ি সর্ব্বস্ব ব্রজনাথ বাবু আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় রত, বুঝিতে পারিয়া হৃদয়ে আরো ব্যথা পাইলেন। যখন এই সকল বিষয়ে বিহারীলাল সাধ্যমত বাধা দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ভিতরে ভিতরে বিহারীলালের কাজে কৃপানাথ বাবু আপনার একটী পোষ্যপুত্রকে বসাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। বিহারীলাল ইহাও বুঝিতে পারিলেন। প্রতারক ও কপট লোকদিগের ব্যবহারে দিন দিন সংসারের প্রতি তাহার একটী অভূতপূর্ব্ব বিরক্তির ভাব জন্মিল। সাধারণের যে হিংসা, দ্বেষের ভাবকে তিনি একদিন দয়ার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন, সংসারের যে নিন্দাবাদকে একদিন তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিতেন, সে সকল ক্রমে ক্রমে ইহার অন্তরে মনুষ্য চরিত্রের প্রতি একপ্রকার বিরক্তি বা অভক্তির ভাব উপস্থিত করিল। একদিকে চিন্তামণির গভীর যন্ত্রণা, অন্যদিকে সংসারের নানাপ্রকার লোকের নানা জঘন্য ব্যবহার তাঁহার হৃদয়কে ক্রমে ক্রমে সংসারের আশা ভরসা হইতে টানিয়া ঊর্দ্ধদিকে লইয়া চলিল। তিনি মনে করিলেন,--আমার বাড়ী ঘর টাকা কড়ি আছে বলিয়া লোকে দ্বেষ করে, যশ মান আছে বলিয়া লোকে হিংসা করে, আর বিদ্যা বুদ্ধি আছে বলিয়া লোকে প্রতিযোগিতা করিতে চায়। ভাবিলেন, বিদ্যাবুদ্ধি, যশমান, টাকাকড়ি,এ কিছুতেই আমার প্রয়োজন নাই;—যদি দীন দুঃখীর দেশে মানবের চির সহায় দয়াল হরিকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারি,তবেই জীবন সার্থক হয়। পৃথিবীর সকল পরিত্যাগ করিয়া যদি হৃদয়-মন্দিরে সেই পবিত্রস্বরূপকে ধ্যান করিতে পারি, তবে আমার জীবনের সকল মলিনতা দূর হইবে। নিজে পাপী, নিজে অহঙ্কারী, অন্যের দোষ কি দেখিব, কি গণনা করিব ? এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার জীবনে এক নূতন ভাব উপস্থিত হইল। এই সময় হইতে চিন্তামণির জন্য তাঁহার অন্তরে দারুণ অনুতাপ আরম্ভ হইল। কৃপা-

নাথ বাবুকে পূর্ব্বে কেন চিনিতে পারিলাম না, এই চিন্তায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিছু দিন পরেই তিনি সভার কার্য্য প্রভৃতি সকল পরিত্যাগ করিয়া নিজে স্বাধীন হইলেন। সেই স্বাধীনতা কি? অর্থাৎ সকল বাধা বিপত্তির হাত হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ আত্মাকে ঈশ্বরের চিন্তায় রত করা, ও সংসারের সকল অবস্থা বিস্মৃত হইয়া পাপীতাপীর জন্য জীবন সমর্পণ করা। বিহারী যে অবস্থাকে স্বাধীনতা বলেন, সংসারের লোকেরা সেই অবস্থাকে ভিখারী বলিয়া ব্যাখ্যা করে। সুতরাং এতদিন পরে বিহারী ভিখারী হইলেন।

এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের পর বিহারী ও গিরিবালার জীবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গভীর নিশীথে গবাক্ষ পথে।

গভীর রজনী যোগে একটী রমণী গবাক্ষপথে বসিয়া রাত্রি-জাগরণ করিতেছেন, আর মনে মনে বলিতেছেন—"সভা সভা করে লোকগুলো অস্থির হলো, এত রাত জেগে রয়েছি, এখনও এলো না, আজ এলে একটা কাণ্ড বাধাব।" এই রমণী কে? কৃপানাথ বাবুর স্ত্রী, নাম জ্ঞানময়ী।

প্রায় তৃতীয় প্রহর রজনী অতীত হইলে কৃপানাথ বাবুর গাড়ী আসিয়া দরজায় লাগিল, জ্ঞানময়ী সময় বুঝিয়া কৃপানাথ বাবুকে যাইয়া লইয়া আসিলেন। তারপর বলিলেন, আজ তোমাদের সভায় কি হলো?

কৃপানাথ।—আমরা জিতেছি, বিহারী বাবুর নামে আমরা ভোট অব সেন্সার পাশ করেছি।

জ্ঞানময়ী।—যাহা হউক, তোমরা খুব মজালে! তোমাদিগকে আবার লোকে সংস্কারক বলে! দেশের কি হলো!

কৃপানাথ।—তোমার উপদেশ এখন রেখে দেও।

জ্ঞানময়ী।—তা রেখে দেব বই আর কি কর্‌ব? যদি ক্ষমতা থাক্‌তো তবে তোমাদের ন্যায় ভণ্ড হিতৈষীদের যশ মানকে একবারে খর্ব্ব কর্‌তাম।

কৃপানাথ।—কেন, চেষ্টা করে দেখ্‌লে ক্ষতি কি?

জ্ঞানময়ী।—আর ঠাট্টা করোনা, তোমাদের দর্প একদিন নিশ্চয় চূর্ণ হবে।

কৃপানাথ।—থা'ক, বাজে কথায় আর কাজ নাই, ব্যাপারটা কি, বলত?

জ্ঞানময়ী।—ভবানীকান্ত বাবুকে আজ ডাক্তার দেখে বলে গেছেন যে, ব্যারাম আর কিছুই নহে, কেবল মানসিক কষ্টের ফল। এ কষ্ট আর কিছু কাল স্থায়ী হলে ভবানীকান্ত বাবুর জীবন সংশয় হবে।

কৃপানাথ।—আমি সব বুঝ্‌তে পার্‌তেছি, চিন্তামণির জন্য আমার প্রাণে বড়ই ব্যথা পেয়েছি।

জ্ঞানময়ী।—কি আশ্চর্য্য, তবুও ত তোমাদের আক্কেল হয় না! আবার কোন্ সাধে গিরিবালার সর্ব্বনাশ কর্‌তেছিলে?

কৃপানাথ।—গিরিবালা বালিকা।

জ্ঞানময়ী।—চিন্তামণির মূর্ত্তি দেখ্‌লে প্রাণ ফেটে যায়! জন্মদুঃখিনী কুসুমের খেটে খেটে অস্থি চর্ম্ম সার হয়েছে; ভবানীকান্ত বাবুকে যে প্রকার ভাবে শুশ্রূষা কর্‌তেছে, কোন পতিব্রতা সতী সে প্রকার পারে না। ধন্য কুসুমের জীবন, সে কি প্রকার পীড়িত ভবানীকান্ত বাবুর শুশ্রূষা কর্‌তেছে! কুসুমের আর কোন সাধ নাই, একবার মাত্র বিহারী বাবুর সহিত জন্মের মত দেখা কর্‌তে চায়, তাও তোমরা দিবে না; ছি, ধর্ম্মের নিকটে কি এত অত্যাচার সয়?

কৃপানাথ।—চিঠি লিখ্‌তে দিয়াছি, এই যথেষ্ট, আবার সাক্ষাৎ?

জ্ঞানময়ী।—তোমরা যখন এই প্রকার নিষ্ঠুরের ন্যায় কথা বল, তখন তোমাদের হৃদয়ে কি একটুও আঘাত লাগে না? অন্তরদর্শী দেবতা তোমাদের সব কার্য্য দেখ্‌তেছেন, ধর্ম্মের চক্ষে এত দাগাবাজী কখনও সহিবে না।

কৃপানাথ।—ধর্ম্ম কর্ম্মটা কি? ওটা কেবল মাত্র এক্‌টা মানসিক দুর্ব্বলতার ফল!

জ্ঞানময়ী।—এতকাল পরে তোমাদের সব বুঝ্‌তে পেরেছি, এখন বড়ই অনুতাপ হয়, কেন তোমাকে ভালবেসেছি!

কৃপানাথ।—তবে আর ভালবেস না।

জ্ঞানময়ী।—"তোমার ন্যায় ভণ্ডতপস্বীকে ভালবাসা নরক ভোগ, তা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমরা চক্রান্ত করে দেবতা সদৃশ বিহারী বাবুকে পথের ভিখারী করেছ, তিনি তোমাদের অত্যাচারে পৃথিবীর সকল সুখের আশা ত্যাগ করেছেন। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তোমরা যা করেছ, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু এ হতভাগিনী আর তোমার ধন ঐশ্বর্য্যের মায়ায় ভুলিয়া থাক্‌বে না। ধর্ম্মকে যখন তুমি বাহিরের আড়ম্বর ও মানসিক দুর্ব্বলতার ফল বলিতে একটুও সঙ্কুচিত হলে না, তখন আর তোমাকে কেমন করে ভালবাস্‌ব !! আজ হতে তোমার মমতা বিসর্জ্জন দিলাম।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে জ্ঞানময়ীর কণ্ঠ রোধ হইল, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিতে লাগিল।

এই কথার পর কৃপানাথ বাবু সহসা আর কোন কথা বলিলেন না, তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যেন সহসা বজ্রাঘাত হইল; ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া বলিলেন;—"সত্যের জয় হউক, সত্যের জয় হউক, তোমার ধর্ম্ম বিশ্বাসের নিকট আমি আজ পরাস্ত হইলাম।"

জ্ঞানময়ী পুনরায় বলিলেন,—তোমাদের হৃদয় মন কি প্রকার জঘন্য, তাহা একবার চিন্তা করে দেখত? গিরিবালা তোমার আশ্রয়ে ছিল, এই সুযোগে তাহার প্রতি ব্রজনাথের কুটীল চক্ষে দৃষ্টিপাত করা কি ধর্ম্ম, রুচি ও সমাজ বিরুদ্ধ হয় নাই? তারপর গিরিবালাকে বিহারী বাবু বলপূর্ব্বক তোমাদের হাত হতে উদ্ধার করেছেন বলে তোমরা প্রাণপণ করে তাঁহার অপকারের চেষ্টায় আছ, ইহা কি প্রকার পশু-চরিত্রের ন্যায় জঘন্য, একবার ভেবে দেখত !! মানুষ অনেক কুকার্য্য করিতে পারে, তা সত্য, কিন্তু ধর্ম্মের নাম দিয়া তোমরা যা করেছ, ইহা পশুতেও পারে না। এই বলিয়া জ্ঞানময়ী নীরব হইলেন। কৃপানাথ বাবু দুঃখ, লজ্জা ও অনুতাপে কাতর হইয়া বলিলেন,—আমি যে অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও ভাল; তুমিও যদি আমাকে ক্ষমা না কর, তবে আর আমার নিস্তার নাই। জ্ঞানময়ি! আশ্রিত জনকে কৃপা করিয়া ক্ষমা কর, প্রাণে রাখ। এই বলিয়া কৃপানাথ বাবু বলিলেন, যে প্রকার অবস্থা উপস্থিত, আর কোন উপায় দেখি না।

জ্ঞানময়ী বলিলেন;—বিহারী বাবুর স্মরণাপন্ন হও, তিনি ভিন্ন আর উপায় নাই।

কৃপানাথ বাবু।—বিহারী বাবুর নিকট আর কোন্ মুখে কথা বল্‌ব?

জ্ঞানময়ী।—তুমি যদি বল্‌তে না পার, তবে একখান পত্র লেখ। তিনি যদি চেষ্টা করেন, তবে এখনও বোধ করি চিন্তামণির মন শান্ত হয়। নচেৎ আর উপায় নাই।

কৃপানাথ বাবু বলিলেন, অগত্যা তাহাই করিতে হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিহারীলালের পত্র।

চিন্তামণির পত্র পড়িয়া বিহারীলাল উত্তম রূপে বুঝিতে পারিলেন যে, পিতৃমাতৃহীন অনাথা আর জীবনে সুখ পাইল না! একমাত্র বিহারীর জন্য চিন্তামণি ধন ঐশ্বর্য্য, সুখ সম্পদ সকল তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন.—সকলকে যেন বলিতেছেন, "সাবধান, যে হৃদয় বিহারীকে উৎসর্গ করিয়াছি, এ হৃদয়ের নিকট আসক্তিরূপে আসিয়া জীবনের জপমন্ত্র হইও না।" চিন্তামণি সংসারের সকল আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, সকল কামনা বিসর্জ্জন দিয়াছেন কি জন্য? ঐ ভিখারী বিহারীর জন্য। বিহারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, ভিখারী হইয়াছেন, এ সংবাদ বিহারী চিন্তামণির নিকট কেন লিখিয়াছিলেন? তিনি মনে করিয়াছিলেন, "এ সকল কথা লিখিলে চিন্তামণি আমাকে ঘৃণা করিবে, এবং আমাকে ঘৃণা করিলে হৃদয়ে সুখশান্তি পাবে।" কিন্তু হায়, চিন্তামণি কি বিহারীর ধন ঐশ্বর্য্যের জন্য বিহারীকে ভাল বাসিয়াছিলেন? চিন্তামণি সংসারের কিছুই চায় না: ধন, জন, মান সম্ভ্রম এ সকল বিহারীর পবিত্র ভালবাসার নিকট তুচ্ছ। চিন্তামণির কি গভীর ভালবাসা! রমণীর হৃদয় কি নির্ম্মল স্নেহের ভাণ্ডার!! বিহারীলাল দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইলেন। চিন্তামণির পত্রের আর কি উত্তর লিখিবেন? লিখিবার আর কি আছে? উত্তর না লিখিলে চিন্তামণি আরও কাতর হইবে, ইহা ভাবিয়া, কিছু না লিখিবার থাকিলেও, বিহারীলাল নিম্নলিখিত রূপ উত্তর লিখিলেন;—

"চিন্তামণি! তুমি নির্ব্বোধ, সংসারের কিছুই জান না, সংসারের কিছুই বুঝনা। তুমি পাগল হয়েছ, কেন? মৃত্যুই কি জীবের শেষ, সংসারই কি জীবের একমাত্র বিহার ক্ষেত্র? অহেতুকী নিষ্কাম ভালবাসা জীবনে যেমন,

মরণান্তেও তেমন, তুমি কাতর হও কেন? যাহাকে ভালবাসিয়াছ, অনন্তকাল তার নীরব প্রেম তোমার প্রতি ধাবিত হইবে। আমারও হৃদয় আছে, তোমারও আছে, কিন্তু ভবানীকান্ত বাবুর কি হৃদয় নাই? অপরাধীর অপ-রাধ বিস্মৃত হইয়া ক্ষমা করা প্রকৃত হৃদয়বান মনুষ্যের কার্য্য; ভবানীকান্ত বাবুর অপরাধ বিস্মৃত হও, নচেৎ ঐ হৃদয় যে তোমারই জন্য শুষ্ক হইয়া যাইবে? ভবানীকান্ত বাবুর অপমৃত্যু হইলে তোমাকেই আমি অপরাধিনী মনে করিব।

এ পৃথিবীতে আমার বলিবার আর কিছুই নাই। আমার বিষয় বৈভব খুল্লতাতমহাশয়দিগকে দান করিয়াছি;—এত সাধের সভা কৃপানাথ বাবুকে দান করিয়াছি; আমার জীবনের সকল সুখের মূল যে তুমি, তোমাকে অম্লান বদনে ভবানীকান্ত বাবুকে দান করিয়াছি;—আমার আর কি আছে? আমা-কেও আমি দান করিয়াছি। আমার এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র আত্মা পরমাত্মাকে দান করিয়াছি, আমি আর আমার নই, আমি পরমাত্মার;—তাহাতেই এখন আমি সঞ্জীবিত, অনুপ্রাণিত। এই যে ক্ষুদ্র আমি, এই আমি মহৎ আত্মা ঈশ্বরতে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। আমার শরীর, আমার ইন্দ্রিয়, এ সকল সংসারের বটে, কিন্তু আমি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা এখন ঈশ্বরের। তুমি কি আমার শরীরকে ভালবাসিতে? আমার ইন্দ্রিয়কে ভালবাসিতে? তবে চিন্তা-মণি, তুমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মর, পৃথিবীতে তোমার জন্য সুখ শান্তি ঈশ্বর রাখেন নাই। আর যদি তুমি আমাকে ভালবাসিয়া থাক, তবে আমি যাঁহার, তাঁহাকে ভালবাস, তাঁহাকে ভালবাসিয়া আমার হও। এইরূপ করিলে, দেখিতে পাইবে, ভবানীকান্ত বাবু পৃথিবীতে থাকিয়াও যেন নাই বলিয়া বোধ হইবেন; তিনি আমাদিগের ভালবাসার একটুও বাধা বিঘ্ন জন্মাইতে পারিবেন না। যদি ভিখারীকে ভালবাসিয়া থাক, তবে কাতর হইও না, সংসারের বাধাকে ভালবাসার বাধা বিঘ্ন মনে করিও না। চিন্তামণি, আবার দেখ, মাত্র শরীরের জন্য একটা সম্বন্ধই হইতে পারে না। শরীর মানবের কদিন? দুদিন চারিদিন মাত্র। কেবল মাত্র এই দু চারিদিনের জন্য কি মানবের ভালবাসার পরিণতি—বিবাহ? না—তা—কখনই নহে। সম্বন্ধ আত্মার, বিবাহ আত্মার। নচেৎ ধূলি অপেক্ষাও হেয়, অস্থায়ী ও চঞ্চল শরীরের অধিকারী মানব কখনই কাহারও সহিত মিলিত হইত না, নিত্যস্থায়ী প্রেমের জন্য লালায়িত হইত না। প্রেম অনন্তকাল স্থায়ী; প্রেম আত্মার,

বিবাহ আত্মার। এই শিক্ষা যাঁহার হইয়াছে, তাঁহারই আত্মতত্ত্ব শিক্ষা হইয়াছে, তিনিই পরকালের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন; এবং যিনি পরকালের শিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে। চিন্তামণি, সকল ছাড়িয়া এই আত্মতত্ত্ব শিক্ষা কর, ঈশ্বর তোমার হইবেন, পরকাল তোমার বিহার-ক্ষেত্র হইবে, এবং দেখিবে, সেখানে তোমার পার্শ্বে এই ভিখারী বিহারী মলিন ভাবে তোমার প্রেম-ভিখারী হইয়া রহিয়াছে। যে ভালবাসা মৃত্যুতে শেষ হয়, যে প্রেম মৃত্যুতে লয় পায়, তাহার মমতা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত আত্মতত্ত্ব শিক্ষায় নিযুক্ত হও। দুঃখ দুর্দ্দিনের কথা ভুলিয়া চিরকালের সুখ সম্পদের বিষয় চিন্তা কর।

তোমার পত্রখানি অনেকদিন হইল পাইয়াছি, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই উত্তর দেই নাই। উত্তর দিবার ইচ্ছাও বড় একটা ছিল না.—কারণ, মনে করিয়াছিলাম, আমার সহিত তোমার পত্রাদি চলিতে থাকিলে ভবানীকান্ত বাবুর হৃদয়ে আঘাত লাগিবে। হায়, ভবানীকান্ত বাবুর কি কষ্ট! হাতে তুলিয়া ভদ্রলোক বিষ পান করিয়াছেন! কুসুম, প্রাণের কুসুম, শুনিলাম ভবানীকান্ত বাবু পীড়িত হইয়াছেন, শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইতেছে। তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু কৃপানাথ বাবু তোমাদের বাড়ীতে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। তোমার সহিত দেখা হইল না বলিয়া তত দুঃখ নাই, কিন্তু ঐ ভদ্রলোককে একবার দেখিতে সাধ ছিল! কিন্তু সে উপায় নাই। তুমি প্রাণপণে উহার শুশ্রূষা করিও, দেখিও ভবানীকান্ত বাবু যেন কখনও মনে করিতে অবসর পান্ না যে, তাহাকে ভালবাস না বলে শুশ্রূষা কর না। আর একটী কথা কেবল লোকে বলিবে বলিয়া লিখিতেছি না, কারণ আমি জানি, তুমি লোকের কথাকে কিছুই মনে কর না,—আর একটী কথা, এই সময়ে তোমার অযত্ন প্রকাশ পাইলে, ধর্ম্মের নিকট তুমি অপরাধিনী হইবে;—ভবানীকান্ত বাবুর মৃত্যু হইলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, ইহা কখনও মনে স্থান দিবে না। আপন স্বার্থের জন্য কখনও অন্যের জীবন নাশের কামনা করিবে না। মনে রাখিও, পাপ কার্য্যে লিপ্ত হওয়া ও পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করা, একই কথা। যে মনে মনে পাপ করে, সেই প্রকৃত দোষী, পাপ কার্য্যটা মাত্র একটা বাহিরের আবরণ মাত্র,—সে জন্য শরীরই কষ্ট সহ্য করে; প্রকৃত পাপ যাহা, তাহা মনের। সাবধান, স্বীয় স্বার্থ-চিন্তায় অন্ধ হইয়া অন্তরদর্শী ঈশ্বরের চক্ষে যেন অপরাধিনী না হও।

আর কি লিখিব। তুমি অবশ্য শুনিয়াছ যে, বিজয়গোবিন্দ গিরিবালাকে লইয়া দক্ষিণ সাবাজপুর গিয়াছেন। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, ঈশান কলিকাতায় আছে। তোমার স্নেহ-ভিখারী—বিহারী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারী ও ভিখারী।

অর্থের সহিত বিজয়গোবিন্দের যতই ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। বিজয়গোবিন্দ বাল্যকাল হইতে দারিদ্র্যের সহিত সহবাস করিয়া অমায়িকতার একটী প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছিলেন; কিন্তু কর্ম্ম পাইবার পরে সে ভাব তিরোহিত হইল। যদিও বিজয়ের জীবনের কর্ত্তব্য পথ আজ পর্য্যন্তও পরিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু বিহারী মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলেন, বিজয়ের জীবন কালে একটী আদর্শ জীবন হইবে। বিহারী এবং বিজয় যখন এক সঙ্গে উপাসনায় বসিতেন, তখন বিহারী বুঝিতে পারিতেন, বিজয়ের অন্তর ভেদ করিয়া যেন ভক্তি ও বিশ্বাসের জলন্ত ভাব বাহির হইতেছে। এ প্রকার ভক্তের জীবন কালের পরাক্রমে সাংসারিকতায় ডুবিয়া যাইবে, ইহা কে কল্পনা করিতে পারে? বিহারীলাল অনেকদিন পর বিজয়গোবিন্দের একখানি পত্রে, মনুষ্যের হৃদয় মন সংসর্গের আধিপত্যে কি প্রকার রূপান্তরিত হয়, তাহা জানিতে পারিলেন। পত্রখানি এই ঃ—

প্রিয় বিহারী বাবু,—

আমরা এখানে আসিয়া এক প্রকার সুখে আছি; দিন দিন অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমার মানসিক উন্নতি হইতেছে; এখন ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বের চিন্তা সকল সার-শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে বুঝিতে না পারিয়া উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, এখন সে জন্য বড়ই অনুতাপ হইতেছে। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া লোক অস্থির হয় কেন, বলিতে পার? পৃথিবীতে এমন কুসংস্কারও মানব সমাজকে মোহান্ধকারে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে! ঈশ্বরের উপাসনা করা, ঈশ্বরের চিন্তা করা, এ সকলই বাতুলতা।

মনুষ্য কেন বৃথা এ সকল কার্য্যে সময় ক্ষেপণ করে! আমার এখন হৃদ্‌বোধ হইয়াছে, আমি এতদিন মহা অজ্ঞানতায় ডুবিয়াছিলাম! এত-দিন পরে আমার জীবন যেন কারামুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি আমার জীবনের এক মাত্র বন্ধু, তোমাকে এ সকল হৃদয়ের কথা বলিলেও সুখ পাই। তাই তোমাকে অন্তরের কথা বলিলাম।

এখানে আসিয়াও ব্রজনাথ বাবুর চক্রান্তের হাত হইতে নিস্তার পাই নাই। ব্রজনাথ বাবু নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়া গিরিকে আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। শুনিলাম, কৃপানাথ বাবু এক্ষণে একটু শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রজনাথ বাবু দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সংগ্রামে নামিয়াছেন। আমি এতদিনে প্রকৃত ভণ্ডদিগের ভণ্ডামী বুঝিতে পারিতেছি। ইহারা বাহিরে ধর্ম্মের একটা আচ্ছাদন রাখে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে পশুর অপেক্ষাও ঘৃণিত কার্য্যে নিযুক্ত। তোমাকে সত্য কথা বলিতে কি, ইহাদিগের ব্যবহারই আমার জ্ঞানপথের একমাত্র সহায়, যদি ইহাদিগের ভণ্ডামী আমার নিকট প্রকাশিত হইয়া না পড়িত, তবে কখনই আমার কুসংস্কার ঘুচিত না। এত দিনের পর আমি সকল বুঝিয়াছি; দুঃখ এই, তুমি সকল বুঝিয়াও মোহান্ধ-কারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে না। সে যা হউক, আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, আমি আর গিরিবালাকে রাখিতে পারি না। আমি বুঝিতে পারিতেছি, গিরি অন্তরে গরল ধারণ করিয়া আছে,- এ জীবনে তুমি ভিন্ন তাহার আর সুখের বস্তু কিছুই নাই। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও তাহার ভ্রম দূর করিতে পারি নাই; ইহার মধ্যে তোমার কোন বাসনা বা দুরভিসন্ধি আছে কি না, জানি না; কিন্তু আমার বিশ্বাস কিছুই নাই। আমি তোমার ভিতরে ঈশ্বর-বিশ্বাসের একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতেছি,— তুমি ভিন্ন আর সকলেই ভণ্ড, তোমার প্রতি আমার একটুও অবিশ্বাস নাই। তোমাকে না জানিলে ধর্ম্মের প্রতি আমার একটা অভক্তি জন্মিত। গিরি সম্বন্ধে তোমার প্রতি আমার একটুও অবিশ্বাস নাই। কিন্তু গিরির হৃদয়ের ভাবে এক দিকে আমি যেমন মোহিত হইয়াছি, অন্যদিকে তেমন নিরাশা আসিয়া হৃদয়কে গ্রাস করিতেছে। আমি উপায়ন্তর না দেখিয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছি। তুমি অবশ্য জান, আমি হিন্দু সমাজকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। যদি সম্ভব হইত, গিরির বিবাহ দিতাম; কিন্তু গিরির মন পরিবর্ত্তিত না হইলে কেহই বিবাহ করিতে চায় না। গিরির একটা ঠিক না হওয়া

পর্য্যন্ত আমিও কিছু করিতে পারিভেছি না। আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু কোথায় কি প্রকারে হইবে, কিছুই জানি না।

তোমার অবস্থা স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে; যতই তোমার বিষয় চিন্তা করি, ততই অন্তরে যাতনা বৃদ্ধি হয়। তোমার জীবনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, কিন্তু তুমি সেই উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইবে, সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। পৃথিবীতে কিছু কার্য্য করিতে হইলে পূর্ব্বে মান সম্ভ্রম সকলি চাই। তুমি যাহাদিগের মধ্যে কার্য্য করিতে বাসনা করিয়াছ, তাহারা তোমাকে দেখিলেই ঘৃণা করিবে। তুমি বাবুগিরির অত্যন্ত বিরোধী, তাহা জানি, কিন্তু তুমি কখনই ভিখারীর বেশে দেশের উপকার করিতে পারিবে না। তোমাকে এখনও বলি, তুমি বর্ত্তমান বেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশের উপযোগী পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে আরম্ভ কর।

আর একটী কথা, কৃপানাথ বাবু ও ব্রজনাথ বাবু তোমাকে এবং আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে একটুও ত্রুটি করেন নাই;—জগতের নিকট ইহারা আজও অপ্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া সংসারের মহা অনিষ্ট করিতেছেন, আপনাদেরও পরিণাম ডুবাইয়া দিতেছেন। তুমি যদি ইহাদিগের ভণ্ডামীর হাত হইতে দেশকে উদ্ধার করিতে পার, তবে দেশের প্রকৃত মঙ্গলের কার্য্য করা হয়। আমি শুনিলাম, ইহারা আবার তোমাকে জেলে পাঠাইবার উপায় অন্বেষণ করিতেছেন! তুমি এবং আমি উভয়ে যদি একত্র হইয়া ইহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, তবে নিশ্চয় জানিও, ইহারা যতই অহঙ্কারী বা ক্ষমতাশালী হউন না কেন, ইহাদিগের উন্নত মস্তক পৃথিবীর নিকট নত হইবে। কেন ভয় পাও? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমি যদি ইহাদিগের হাত হইতে দেশকে রক্ষা না কর, তবে তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। ইহাদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে প্রথমে ইহাদিগের সমকক্ষ হইতে হইবে; তুমি তোমার বিষয় নিজ হস্তে গ্রহণ কর কিম্বা উপস্বত্ব গ্রহণ করিতে আরম্ভ কর। তারপর ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হও। ভরসা করি, আমার পত্রখানি তুমি মনোযোগে পাঠ করিবে। আমরা এক প্রকার ভাল আছি।

তোমার অভিন্ন-হৃদয়-- বিজয়গোবিন্দ।

বিজয়ের পত্রখানি বিহারীর হৃদয়কে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিল; বিজয়গোবিন্দ বিহারীর অতি ভালবাসার পদার্থ, বাল্যকাল হইতে আজ

পর্য্যন্ত সমভাবে ইহাকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে রাখিয়া আসিয়াছেন, সেই বিজয়-গোবিন্দের ধর্ম্মমত সংসারের নানাপ্রকার কুটিল চক্রে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা বিহারীর প্রাণের অসহ্য। বিজয়ের স্বাধীন মত যাহাই থাকুক না কেন, উভয়ের মধ্যে ভালবাসার হ্রাস হইবে না, ইহা বিহারীর দৃঢ় সংস্কার। তিনি ব্যথিত অন্তরে বিজয়গোবিন্দকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন।

"প্রিয় বিজয়,

অনেকদিন পরে তোমার উপদেশ ও স্নেহপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া আশা করিয়াছিলাম যে, হৃদয়ে তৃপ্তিলাভ করিব, কিন্তু তাহা হইল না। তুমি আমার হৃদয়ের প্রত্যেক কথাই জান, এ হৃদয়ের কোন অংশ তোমার নিকট অপ্রচ্ছন্ন নাই, আমার একমাত্র ভালবাসার অন্যতর পদার্থ পৃথিবীতে তুমি; দুঃখ এই, আজ তোমার নিকটেও আবার মন খুলিয়া পত্রের উত্তর লিখিতে হইল। তুমি উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছ, তোমার পত্রের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি যাহা লিখিব, এ সমুদয় আমার হৃদয়ের কথা, হৃদয়ের কথা শুনিবার সময় তর্কজ্ঞান বিস্মৃত হওয়া উচিত। আমার হৃদয়ের কথাতে ও জীবনে কোন পার্থক্য নাই, আমার জীবনের মূলেই বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের কয়েকটী কথা, একান্ত আবশ্যক বোধে, তোমাকে আজ লিখিলাম; আশা করি, তুমি আপন স্নেহ গুণে এই পত্রখানিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না।

১। সংসারের নানা প্রকার কষ্ট যন্ত্রণার হাতে পড়িয়া এবং দুরভিসন্ধি-ময় মানবের কুটিলতার পূতিগন্ধযুক্ত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তুমি নানা প্রকার অসার চিন্তাকে পরিশোষণ করিতেছ, তাহা তোমার পত্র পাঠে আমি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেছি, না হইলে তুমি সাহসপূর্ব্বক বক্ষ স্ফীত করিয়া কখনই ঐ মত গুলি আমার নিকট ব্যক্ত করিতে না। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া জগৎ অস্থির কেন, তাহা আমি জানি না; তবে আমি কেন ঐ একমাত্র ধর্ম্মের আকর্ষণে উন্মত্ত হইয়া বাতুলতার প্রশ্রয় দিতেছি, তাহা বলিতে পারি;—আমি সংসারের সমস্ত আসক্তি যাহার মমতায় পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছি, তাহা বলিতে পারি। ধর্ম্ম কর্ম্ম একদিকে ধরিতে গেলে কুসংস্কার বই আর কি? কারণ, ঈশ্বরের উপাসনা করা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে গেলে, কেবল শূন্যের পূজা করা মাত্র। কিন্তু বিজয়, স্থিরভাবে একবার আপনার সম্বন্ধে চিন্তা কর ত? তুমিই বা কে? আমিই বা কে? মাত্র শরীরই কি আমরা; যাহা দুদিন

পরে মৃত্তিকায় মিশাইয়া যাইবে, সেই শরীরই কি আমরা? যদি তাই হয়, তবে মৃত্যু কি? আজ বা কেন আমাদের শরীর চলিতেছে, কাজ করিতেছে, কত বাসনা করিতেছে, আবার কিছুদিন পরে মৃত্যুর পরে কেন সে প্রকার পারে না? এই শরীর এখন যেমন, মৃত্যুর পরে কেন তেমন থাকে না? এই প্রশ্নের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধানে যদি নিযুক্ত হও, তবে দেখিবে, শরীরই মানব নহে, এই শরীরের মধ্যে এমন আর কোন পদার্থ আছে, যাহাকে মানব বলা যায়। শরীরের মধ্যে কি আছে, সে বিষয়ে তোমাতে আমাতে মত-বৈষম্য থাকিতে পারে, কিন্তু কিছু যে আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই কিছু যাহাই হউক না কেন, তাহা অবয়ব শূন্য, আকৃতি শূন্য; কারণ তাহা তুমিও দেখিতে পাও না, আমিও পাই না। তবে দেখ তুমি এবং আমি উভয়েই অবয়ব শূন্য। অতএব যাহাকে আমরা আত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করি, তাহা অবয়ব শূন্য। দেখ আমরা কত বিষয় স্মরণ করিয়া রাখিতে সমর্থ, কত চিন্তা করিতে সক্ষম, কত ভালবাসিতে সক্ষম; মনুষ্যের ক্ষমতার বিষয় আর তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এই যে মনুষ্য, এও দেখ অবয়ব-শূন্য। বলত আমরা অবয়ব-শূন্য মনুষ্যকে লইয়া এত ব্যস্ত কেন,—আমার আমার করিয়া এত অস্থির কেন? বলত আমার আমার করিয়া মানুষ এত অস্থির কেন;—আমিত্বকে এত ভালবাসে কেন,স্ত্রী-পুত্রকে ভালবাসে কেন,—কেন এত বিড়ম্বনা? আমরা দুদিন সংসারে আছি, এই দুদিনের জন্য কেন শোক তাপ, দুঃখদারিদ্র্য পীড়নে কাতর হই? আর কেনই বা সুখ উল্লাসে নৃত্য করি? তুমিও অবয়ব-শূন্য, আমিও তাই, তবুও দেখ আমাদিগকে আমরা ভালবাসি। যে কারণে আমার অবয়ব-রহিত কতকগুলি শক্তিযুক্ত আত্মাকে আমি পূজা করি, ভালবাসি,সেই কারণেই অবয়ব-শূন্য অনন্তশক্তির ভাণ্ডার অনন্তদেবকে পূজা করি, ভালবাসি। মূল কথা এই,—মানুষ আপনাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না, ঈশ্বরকে ভাল না বাসিয়াও থাকিতে পারে না। অস্বাভাবিক রোগগ্রস্ত না হইলে আত্মাকেও মানব ভালবাসিতে বাধ্য, পরমাত্মাকেও ভালবাসিতে বাধ্য। যে আপন আত্মাকে জানে, সে পরমাত্মাকেও জানে; এবং যে আপন আত্মাকে ভালবাসে, সেই পরমাত্মাকে ভালবাসে। এখানে মনুষ্যের ইচ্ছা কার্য্য করে না, এখানে মানবের ইচ্ছা নাই। ইচ্ছা এস্থলে বরং বিপরীত দিকে লইয়া যায়। আমি ঈশ্বরকে ইচ্ছা করিয়া ভালবাসি না,—তাঁহাতে অনেক সুখসম্পদ

আছে বলিয়া ভালবাসি না ;—তাঁহাকে ভালবাসাই আমার প্রকৃতি,—ইহাই স্বভাব। ইচ্ছা মানবকে স্বার্থের পথেই লইয়া যায়, এখানে মানব-ইচ্ছা পরাস্ত হয়। মানুষ যদি বাহিরের আচরণ দ্বারা আপনাকে মলিন না করে, তবে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ আপনা আপনিই হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি আমি জগৎসংসার, কেহই ঈশ্বরকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। আজ না হইলেও একদিন তুমিও ঐ নামে বিমুগ্ধ হইবে। কল্পনার কথা বলিলে, আমিও কল্পনা,তুমিও কল্পনা, ঈশ্বরও কল্পনা; কল্পনায় জগৎ ডুবিয়া রহিয়াছে। আমার ইচ্ছা এস্থলে পরাস্ত হইয়াছে; আমি তাহাতেই জীবিত রহিয়াছি; এবং আশা করি চিরকাল থাকিব। তোমার উপদেশ বাক্য আমার হৃদয়ে কোন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই এবং কখন যে পারিবে, সে আশাও নাই। তুমি আপনাকে যতই জ্ঞানী মনে কর না কেন, আত্মজ্ঞান ও তৎ-সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মজ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের আর জ্ঞান নাই। সেই জ্ঞানকে তুমি যদি অজ্ঞানতা বলিয়া ব্যাখ্যা কর, তবে আমি বলিব, একদিন পুনরায় তোমাকে ঐ অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিতে হইবে। মানুষ আজীবন চেষ্টা করি-লেও ঐ অজ্ঞানতা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না।

২। স্বাধীন মতের আমি অত্যন্ত পক্ষপাতী, তোমার যখন যে মত হয়, সে সকলি আমার নিকট আদরণীয়। শিশু মানব বুদ্ধি যত কিছু চিন্তা করুক, তাহা সকলি অসম্পূর্ণ এবং সকলেই ভ্রম থাকিতে পারে। সেই জন্যই আমি কোন একটা মতকে ঘৃণা বা তুচ্ছজ্ঞান করি না ; আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী হইতে ক্রমে ক্রমে অসত্য লোপ পাইবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। সত্য জয়যুক্ত হয়, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি ব্যক্তিগত মহত্ব এস্থলে স্বীকার করি না, ঈশ্বরের রাজ্যে যাহা সত্য, তাহাই জয়যুক্ত হয়, ইহাই দেখিতে বাসনা। তোমার মতে ভ্রম আছে কি নাই, তাহা বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু তুমি লোকের প্রতি বিরক্ত হইয়া মত পরি-বর্ত্তন করিয়াছ, ইহা বুঝিয়া অন্তরে দারুণ ব্যথা পাইলাম। বিজয়,—মনুষ্যই কি একমাত্র মনুষ্যের লক্ষ্য ? তুমি কি মনুষ্যকে দেবতাজ্ঞান করিয়াছিলে ? তুমি কি মনুষ্যের আদর্শে উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলে ? যদি তাহা না হয়, তবে মনুষ্যের ব্যবহারে তুমি শিক্ষা পাইলে কেন ? আমি বলি, মানুষ চিরকাল মানুষ,—পাপের আধার, ভ্রমে পরিপূর্ণ ; এই অসম্পূর্ণ জীবের মমতা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা একমাত্র সত্য ও পুণ্যের আধার পর-

ব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টি করেন, তাঁহারাই ধন্য। তোমার মত পরিবর্ত্তনে আমি তত দুঃখিত নহি, কিন্তু মনুষ্যের ব্যবহারে তুমি মত পরিবর্ত্তন করিয়াছ, ইহাতে হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাইয়াছি। মনুষ্য কে যে তুমি তাহাকে লক্ষ্য কর? ঈশ্বরই মনুষ্যের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র আদর্শ; মনুষ্যকে ভুলিয়া ঈশ্বরকে লক্ষ্য কর, তাহাকে আদর্শ কর। অন্যের পাপতাপপূর্ণ জীবন দেখিয়া আপনি সতর্ক হইয়া পথে অগ্রসর হও। অন্যের জীবনের দোষ ভুলিয়া আপনার জীবনকে ভাল করিতে চেষ্টা করাই মনুষ্যত্ব। অন্যের অপরাধ ভুলিয়া যাইয়া আপনাকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হও। অপরাধীই অন্যের অপরাধ খুঁজিয়া বাহির করে, কিন্তু যে প্রকৃত সৎলোক, সে কখনও অন্যের অপরাধ অনুসন্ধান করে না, চক্ষের সম্মুখে অন্যের দোষ পড়িলেও তাহা উপেক্ষা করিয়া আপন জীবনে শিক্ষা লাভ করে। তুমি ব্রজনাথ বাবুদের ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া আপনার জীবনকে উন্নত করিতে যত্নশীল হও, প্রকৃত মনুষ্যত্ব যাহা তাহা লাভ করিতে চেষ্টা কর।

গিরিবালার জন্য আমি অত্যন্ত চিন্তিত রহিয়াছি, অবোধ বালিকা কেন আমার প্রতি তাকাইয়া রহিয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারি না; গিরিকে আমি আপন সহোদরার ন্যায় মনে করি।

৩। তুমি আমার অবস্থা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছ, শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। অর্থের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হওয়ায় তোমার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে; মত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এ সম্বন্ধে তোমার পূর্ব্বের মত আমার অন্তরে গাথা রহিয়াছে। মনুষ্য পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে কি প্রকার সামান্য ধূলিকণার ন্যায় আপন মতকে উড়াইয়া দিয়া থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত আমি অনেক দেখিয়াছি। অবস্থার পরিবর্ত্তনে মানব কি প্রকার অসার যুক্তি দ্বারা আপনার অবস্থাকে পোষণ করিয়া থাকে, আমার এই অল্প বয়সে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। তুমি পরীক্ষায় অটল থাকিতে পারিবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তোমার পত্র পাঠে জানিলাম, তোমাকেও সংসারের আবর্জ্জনায় আক্রমণ করিয়াছে। এখন বুঝিতেছি, কৃপানাথ বাবু প্রভৃতি বিলাতে যাইয়া যে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাদেরও বলিবার যথেষ্ট কথা আছে। যাহা হউক, বিজয় তুমি বিলাসের দাস হইয়াছ, সেজন্য আমি যত আশ্চর্য্য হইয়াছি, তুমি আমাকেও মত পরিবর্ত্তন করিয়া দেশের উপযোগী হইতে বলিয়াছ, ইহাতে তদপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইয়াছি। এ সম্বন্ধে তুমি

একটী বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছ। মানব-সমাজ বাহিরের আড়ম্বরে কখনও ভুলে না, কখনও ভুলিতে পারেনা। শক্তিই মানবসমাজকে আন্দোলিত করিবার একমাত্র মহামন্ত্র। ঐ শক্তি না থাকিলে বেশভুষা, মান সম্ভ্রম, যাহাই বল না কেন,এ সকলকেই মানব তৃণের ন্যায় তুচ্ছজ্ঞান করে। যদি আমার হৃদয়ে সেই শক্তি থাকে, এবং বাস্তবিক যদি আমার মনপ্রাণ দেশের উন্নতিকেই সার লক্ষ্য করিয়া থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও, এই ভিখারীর দ্বারাও অনেক কার্য্য হইবে। আর যদি আমার মধ্যে সে প্রকার শক্তি না থাকে, তবে বেশ ভুষা কিছুতেই কিছু হইবে না। আগুনকে কেহ প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে না; সে আপন শক্তিতে জ্বলিয়া উঠিবেই উঠিবে। আমার জন্য সংসারের আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলেই ব্যস্ত! কিন্তু কেন চিন্তা কর? কৃপানাথ বাবুর বাহিরের আড়ম্বর উহাকে আর কত দিন ঢাকিয়া রাখিবে? এক দিন, নয় দশ দিন, তারপর নিশ্চয় জানিও, ঐ গোময়পূর্ণ হৃদয় মন জগতের নিকট প্রকাশিত হইবেই হইবে। যাহা সত্য, তাহা কখনও জগতে প্রচ্ছন্ন থাকে না; আর যাহা মিত্যা তাহাও অধিককাল লোককে ভুলাইতে পারে না। ভিখারী বিহারী সংসারের বেশ ভুষা কিছুই চায় না, কেবল মাত্র জীবনে এই কামনা, ঈশ্বরের করুণা যেন সর্ব্বদাই এ দীনহীনকে উজ্জ্বল করিয়া রাখে।

৪। পত্র খানি অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল, কিন্তু এখনো তোমার একটী কথার উত্তর দিতে অবশিষ্ট রহিয়াছে। কৃপানাথবাবু ও ব্রজনাথ বাবু প্রকৃত ভণ্ড, তাহা আমার জানিতে বাকী নাই, কিন্তু চিরকাল তাঁহাদের জন্য চক্ষের জল ফেলা ভিন্ন আর আমা দ্বারা কিছুই হইবে না। তাঁহারা আমার নিকট অপরাধী নহেন, তাঁহারা ধর্ম্মের নিকট, ঈশ্বরের নিকট অপরাধী। সেই অপরাধের দণ্ড বিধান করিতে হয়, তিনিই করিবেন। অপরাধীর দণ্ডবিধানের ক্ষমতা অপরাধী-মানবের নাই। সেই ব্যক্তিই দোষীকে দণ্ড দিতে অধিকারী, যে কখনও আপনি কোন প্রকার দোষ করে নাই। আমি ঈশ্বরের নিকট কখনও অপরাধ করি নাই, এ অহঙ্কার আমার নাই, সুতরাং আমি তাঁহাদিগের জন্য কিছুই করিতে পারি না। তাঁহারা চক্রান্ত করিয়া আমাকে আবার জেলে দিবেন, সে জন্য আমি ভীত বা দুঃখিত নহি। ঈশ্বরের প্রতি আমার অনুরাগ থাকিলে, জেল বল, অরণ্য বল, সর্ব্বত্রই আমার সুখের স্থান। পৃথিবীর কোন স্থানই আমার একমাত্র

আসক্তির বিষয় নহে, যেখানে থাকি, সে স্থানই ভাল। মনে সুখ না পাইলে রাজভবনও সুখ দিতে পারে না। কৃপানাথ বাবুরা সময়ে আপনারাই সংশোধিত হইবেন, ইহা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি। একদিন গত কার্য্যের জন্য অনুতাপাগ্নি ইঁহাদিগের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। তুমি ইঁহাদিগের সমকক্ষ হইয়া প্রতিযোগিতা করিতে আমাকে বলিয়াছ, তুমি অত্যন্ত ভ্রান্ত। পৃথিবীতে সমকক্ষতা করিয়া শাস্তিদ্বারা কখনও কেহ পাপের হস্ত হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে পারে নাই। সত্যবটে বহুদর্শী বিচক্ষণ রাজদণ্ডধারী মনুষ্যবর্গ পাপের দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা-তেও পাপ নির্ম্মূল হয় না। পাপের মহৌষধ একমাত্র ঈশ্বরের হস্তে, সেই ঔষধ ভিন্ন পাপীর নিস্তার নাই। কি করিলে সেই ঔষধের প্রতি মনুষ্যের মন আকৃষ্ট হয়, তাহা উদ্দীপন করাই মনুষ্যের জীবনের মহত্তর কর্ত্তব্য। প্রকৃত বিশ্বাস বলে, ভালবাসার বলে মনুষ্যের হৃদয় মনুষ্যের হৃদয়কে সেই ঔষধের প্রতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ। আমার হৃদয়ে যদি প্রেম থাকে, ভক্তি থাকে, বিশ্বাস থাকে, তবে নিশ্চয় এক দিন কৃপানাথ বাবুকে সেই ঔষধের দিকে আকর্ষণ করিতে পারিব। মানুষ কত দিন ঈশ্বরের রাজ্য হইতে দূরে পলায়ন করিয়া থাকিবে? একদিন না একদিন ঐ ঔষধের হস্তে পড়িবেই পড়িবে। মানুষ কেন পাপীর জন্য দণ্ডের সৃষ্টি করিবে? ঈশ্বর কি ন্যায়বান নহেন? তাঁহার কি পাপ পুণ্য বিচার নাই? কেন বিজয়, অল্পবিশ্বাসী হও, কেন অপরাধীর অপরাধ স্মরণে দ্বেষ হিংসায় পূর্ণ হও? কেন সংসার গেল, সংসার গেল, মনে কর। ঈশ্বর আছেন, সত্য সত্যই আছেন। পাপ পুণ্য তিনি সর্ব্বদাই গণনা করি-তেছেন। তাঁহার অন্তরদর্শী চক্ষের নিকট সকল প্রকাশিত। তাঁহার জ্ঞানের নিকট সকল উজ্জ্বল। তবে কেন, অবিশ্বাসীর ন্যায় চঞ্চল হইয়া দণ্ড দণ্ড করিয়া অস্থির হও? কেন অসার কামনাকে হৃদয়ে স্থান দান কর? সমা-জের জন্য চিন্তা কি? সমাজ কি মনুষ্যের? আমি বলি সমাজ ঈশ্বরের, কারণ মনুষ্য ঈশ্বরের, ঈশ্বরের সমাজ ঈশ্বর অবশ্য রক্ষা করিবেন! মনুষ্য সকল ভুলিয়া কেবল সেই পুণ্যময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে। সমাজ গেলেও মনুষ্য কটাক্ষপাত করিবে না, দেশ গেলেও মনুষ্য ফিরিয়া চাহিবে না; কারণ মনুষ্য আপনি কিছুই করিতে সমর্থ নহে। ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন মানবের আর কিছুই নাই। পত্র খানি অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল, কি করি, তবুও হৃদয়ের সকল কথা লিখিতে

পারিলাম না; আশা করি, ইহাতেই তুমি আমার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিবে। তোমার স্নেহ-ভিখারী—বিহারী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিহারীর ছিন্ন হৃদয়।

ভবানীকান্ত বাবুর পীড়া ক্রমেই অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, দুঃসহ অনুতাপে ও আত্মগ্লানিতে ভবানীকান্ত বাবুর শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। বিহারীলালের অনুরোধে চিন্তামণি প্রাণপণে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে ভবানীকান্ত বাবু আরো কাতর হইতে লাগিলেন; যাহাদিগের প্রতি ঘোরতর শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহারা পরমাত্মীয়ের ন্যায় আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া ভবানীকান্ত বাবু দিন দিন আরো কাতর হইয়া পড়িলেন; উত্থানশক্তি রহিত হইল, অল্প বয়সে ভবানীকান্ত বাবু মৃত্যু-শয্যার আশ্রয় লইলেন।

কৃপানাথ বাবু ভবানীকান্ত বাবুর এই অসাময়িক দারুণ বিপদে অত্যন্ত মনোক্ষুণ্ণ হইলেন; তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া ভবানীকান্ত বাবুর ইচ্ছানুসারে বিহারীলালকে ভবানীকান্ত বাবু ও চিন্তামণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

বিহারীলাল ঈশানকে সঙ্গে করিয়া কৃপানাথ বাবুর আদেশানুসারে অনেক দিন পরে চিন্তামণির সহিত সাক্ষাত করিতে চলিলেন, যাইবার সময় তাঁহার মনে কতকগুলি চিন্তার বিষয় উপস্থিত হইল;—ভাবিলেন, যাহার সহিত জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখের বিনিময় করিয়াছি, তাহার সহিত এই শেষ দেখা। কেন শেষ দেখা? আর কি বিহারীলাল কখনও চিন্তামণির মুখশ্রী দেখিবেন না? আর কি কখনও কুসুমের প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্য,—পূর্ণবিকশিত মুখকমল নিরীক্ষণ করিবেন না? বিহারী মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, জীবনে আর কুসুমের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। বিহারীলাল হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করিয়া আজ জন্মের মত কুসুমকে দেখিতে চলিলেন।

বিহারীলাল যথা সময়ে ভবানীকান্ত বাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া পশ্চাত্দিক হইতে দেখিলেন, শয্যার ধারে মলিন বেশে বিষণ্ণভাবে বসিয়া চিন্তা-

মণি ভবানীকান্ত বাবুর মস্তকে জল সিঞ্চন করিতেছেন। চিন্তামণির ছুনয়ন হইতে অশ্রু বিন্দু বিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে, সেই বিন্দু ভবানীকান্ত বাবুর ধারাবাহী অশ্রুর সহিত মিলিয়া শয্যায় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। হায়! কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য! উভয়ের জীবনই বিষাদে পরিপূর্ণ, উভয়েই উভয়ের বিষাদ-ভারে মলিন! বিহারীলাল দেখিলেন, কুসুমের গভীর মুর্ত্তি যেন কালিমা-ময় হইয়া গিয়াছে ;—চিন্তামণির জীবনপ্রদীপ যেন অতি কষ্টে আজও মৃদু মৃদু ভাবে জ্বলিতেছে।

ঈশান ইতিপূর্ব্বে বিহারী বাবুর নিকট সকলই শুনিয়াছে, চিন্তামণির এই ভাব দেখিয়া তাহার প্রাণে আর যেন সহ্য হইতেছে না, সে মনে করিতেছে, এখনই চিন্তামণিকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করি। ঈশান মনের ভাব অতি কষ্টে বিহারীলালের ভয়ে গোপন করিতেছে,—হৃদয়ের মধ্যে যে ইচ্ছা উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাকে অতিকষ্টে প্রশমিত হইয়া রাখিতেছে। ঈশান বিহারী বাবুর পানে তাকাইতে পারিতেছে না। বিহারীলালও ঈশানের দিকে চাহিতে পারিতেছেন না। উভয়ে অনিমেষ নয়নে চিন্তা-মণির মলিন মুর্ত্তির পানে তাকাইয়া আছেন। ক্ষণকাল পরে উভয়ে পশ্চাৎ দিক হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ভবানীকান্ত বাবুর সম্মুখীন হইলেন। ভবানীকান্ত বাবু বিহারীবাবুকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু উঠিতে পারিলেন না ; বিহারীলাল নম্র স্বরে বলিলেন, আপনি পীড়িত, আর উঠিয়া দরকার নাই। চিন্তামণি কি করিলেন? ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীযোগে, ঝটিকার প্রারম্ভে, বিদ্যুৎ-আলোকে যেমন সরসীর প্রস্ফুটিত পদ্ম ক্ষণ শোভাযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, সহসা চিন্তামণির মুখও যেন সেইরূপ শোভাযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। চিন্তামণির শরীরের শিরায় শিরায়, স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন একটী আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া নিমেষ মধ্যে সম্পন্ন হইয়া গেল। কুসুম ক্ষণকাল সতৃষ্ণ নয়নে বিহারীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। এমন মধুর শোভা যেন পৃথিবীতে আর নাই!

ভবানীকান্ত বাবু ধীরে ধীরে বিহারীলালের কর ধরিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন,—বিহারী বাবু, আমি সজ্ঞানে হলাহল পান করিয়াছি, আর আমি বাঁচি না, বাঁচিতে আর সাধ নাই, আমি আপনি মরিলাম; চিন্তামণিকেও মারিলাম, আমার আত্মা অনন্ত নরকের উপযোগী হইল! বলিব কি, কিছু বলিতে আর ইচ্ছা নাই। সংসারে আমার স্থান নাই, পরলোকেও নাই!

তবে কোথায় চলিয়াছি? আমার ন্যায় হতভাগা মানবের জীবন মরণ উভয়ই সমান। অনুতাপ ও আত্মগ্লানিতে আমার জীবন শেষ হইল; কিন্তু এখন কোথায় যাইব? আর স্থান কোথায়?" ইহকাল এবং পরকালে আমার ন্যায় নরাধমের আর স্থান নাই।

এই কথা বলিতে বলিতে ভবানীকান্ত বাবুর বাকরোধ হইল, অন্তর ভেদ করিয়া যেন শোকোচ্ছ্বাস বাহির হইতে লাগিল। বিহারী অধোবদনে রহিলেন, তাঁহার দুনয়ন হইতে অজ্ঞাতসারে জল পড়িতে লাগিল। চিন্তামণি আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না,—বলিলেন,—"বিহারীবাবু, হতভাগিনীর জীবনে সকল অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে,—কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম, আবার কোথায় যাত্রা করিতে বসিয়াছি! মাতা কেন বলিয়াছিলেন—'কুসুম বিবাহ করিও না, তাহা এত দিনে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। এখন বুঝিতে পারিতেছি, যদি তোমাকে বিবাহ করিতে বাসনা না করিতাম, তা হলে আর আমার এ দশা হ'ত না। এ জীবনে আমার সকল কামনায় ছাই পড়িয়াছে, কেবল তোমার আদেশ পালনের জন্য আজও জীবিত রহিয়াছি। তোমার আদেশে ভবানীকান্ত বাবুর শুশ্রূষা আমার জীবনে সার লক্ষ্য হইয়াছে। তুমি বলিতে, রমণী অকৃতজ্ঞ,—চিরকাল অবিশ্বাসিনী; সেকথা আমার অন্তরে গাঁথা আছে। জগৎ জানে কে অবিশ্বাসী, জগৎ জানিবে কে অকৃতজ্ঞ! তোমার আদেশ পালন আমার সকল আসক্তির মূল হইয়াছে, নচেৎ কুসুম এতদিন জন্মের মতন শুষ্ক হইয়া যাইত।"

এই মর্ম্মভেদী চিত্র দেখিয়া বিহারীলালের হৃদয়ে এক অচিন্ত্য ভাব উপস্থিত হইয়া শরীর ও মনকে অবসন্ন করিয়া তুলিল, তিনি মৃত্তিকার পানে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন;—"ভবানীবাবু, আপনি যে পথে চলিয়াছেন, মানবের ইহাপেক্ষা আর মঙ্গলের পথ নাই,—আপনিও অপরাধী, আমিও অপরাধী,—ঈশ্বরের চক্ষে সমস্ত মানবমণ্ডলী অপরাধের অতলস্পর্শ সাগরে নিমগ্ন। একদিকে দেখিতে গেলে কোন মানবেরই নিস্তার নাই, কাহারও বাঁচিবার আশা নাই। কিন্তু যখন ঈশ্বরের করুণা ও দয়ার প্রত্যক্ষ ছবি মানব হৃদয়পটে অঙ্কিত হইতে দেখি, তখন মনে হয়, মানবের সমস্ত অপরাধ ঈশ্বরের অপরাজিত দয়ার নিকট ক্ষমার যোগ্য। মানব যত কেন অপরাধী হউক না কেন, এই বিশ্বজনীন প্রেম ও করুণা সকল অপরাধের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে।" মানবের অপরাধ কখনও

ঈশ্বরের দয়াকে অতিক্রম করিতে পারে না। আপনার হৃদয়ে ঈশ্বরের করুণায় যে অনুতাপের অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আপনার জীবনের সমস্ত পাপ উহাতে ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। কিন্তু হায়, আপনি আমার জন্যই জীবনে এত কষ্ট পাইলেন, এ কথা মনে হইলে আমি একেবারে অস্থির হই।"

এই কথা বলিয়া বিহারীলাল নীরব হইলেন, ইচ্ছা থাকিলেও আর মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে চিন্তামণিকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"কুসুম, তোমার গভীর ভালবাসার পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হইয়াছি,—জগৎ জানুক বা না জানুক, তুমি ভালবাসায় সীতা সাবিত্রীর তুল্যা। আমাদের উভয়ের জীবনের বাসনা জীবনে আর পূর্ণ হইল না,—হইবার আশাও নাই। তোমার ভালবাসার নিকট আমার ভালবাসা নিতান্ত অসার ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। আমি যখন তোমাকে যে অনুরোধ করিয়াছি, তাহা তোমার জীবনের নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও, তুমি অম্লানবদনে পালন করিয়াছ। সংসারের চক্ষে না হউক, অন্তরদর্শী ঈশ্বরের চক্ষের নিকট রমণীকুলের মান বজায় রাখিয়াছ। তোমাকে আমার জীবনে আর কিছুই বলিবার নাই; আর কিই বা বলিব? আমার হৃদয়কে আমি ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছি; আমি পৃথিবীর সমস্ত ভালবাসা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। তোমাকে আর কি বলিব? আমার আর একটী অনুরোধ তুমি পালন কর, ইহাই তোমার নিকট আমার শেষ প্রার্থনা;—"তুমি আমাকে ভুলিয়া ভবানীকান্ত বাবুর হও, আমার মমতা পরিত্যাগ করিয়া উহার জীবনের সহায় হইয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর, জীবন বাঁচাও।" এই কথা বলিবার সময় বিহারীর সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, তুনয়ন হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু ধারাবাহী হইয়া পড়িতে লাগিল।

চিন্তামণি ধীর স্বরে বলিলেন;—"পুরুষের পক্ষে সকলি সম্ভব। তুমি যদি পুরুষ না হইতে, তবে কখনই এইরূপ নিদারুণ কথা বলিতে পারিতে না। আমি আজও আছি কেবল তোমার আশায়! নচেৎ আমাকে সংসারে কেহই দেখিতে পাইত না; আমি আজও রহিয়াছি, তোমাকে পাইবার আশায়, নচেৎ কুসুম এতদিন জন্মের মতন শুষ্ক হইয়া যাইত। বিহারি! তুমি জাননা, আমি একমাত্র তোমার জন্য মায়ের কথাকে উপেক্ষা করিয়াছি, তোমার মমতায় জননীর বহুমূল্য আদেশবাক্য বিস্মৃতি-সলিলে বিসর্জ্জন,

দিয়াছি। তোমার আদেশ পালন করিবার জন্যই জীবিত আছি; নচেৎ ভবানীকান্ত বাবু আমার কে? আমি কি সংসারের মান, সম্ভ্রম, টাকা, কড়ির মমতায় তোমাকে ভুলিতে পারি? পৃথিবীতে তুমি আমার, আমি তোমার, তুমি আছ তাই চিন্তামণি আছে, নচেৎ পৃথিবী আমার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাইত। তুমি পুরুষ, তোমার পক্ষে সকলি সম্ভবে; আজ কোন রমণী যদি তোমার ন্যায় এমন নিদারুণ কথা বলিত, তবে সমাজ তাহাকে লইয়া ঘোরতর আন্দোলনে রত হইত। পুরুষের সমাজ পুরুষের আধিপত্য, তোমাদের পক্ষে সকলি সম্ভব।"

চিন্তামণি নীরব হইলেন। বিহারীলাল আর কথা বলিতে পারিলেন না; তিনি ধীরে ধীরে চিন্তামণির হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। আকাশ, পৃথিবী সকল যেন তাঁহার জ্ঞানের নিকট একাকার হইয়া গেল, কিন্তু সকল ভুলিয়া একমাত্র ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। মূর্খ ঈশান নির্ব্বাক হইয়া ভবানীকান্ত বাবুর গৃহে বসিয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নিদারুণ সংবাদে।

বিহারীলাল ক্ষুব্ধ হৃদয়ে আপন বাসাতে প্রত্যাগমন করিলেন; চিন্তামণির ভালবাসা ও গভীর প্রণয় জন্মের মত বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়ঃ, ইহা ভাবিতে ভাবিতে বাসাতে প্রত্যাগমন করিলেন। বাসাতে আসিয়া দেখিলেন যে, বিজয়গোবিন্দের নিকট হইতে এক টেলিগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে; অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে টেলিগ্রাম খুলিয়া দেখিলেন, ভয়ানক বিপদ উপস্থিত;--টেলিগ্রামে যাহা লেখা ছিল, তাহার ভাবার্থ এই রূপ, 'জল প্লাবনে ঘর দরজা সমস্ত জলে ডুবিতেছে, এবং ক্রমশঃই জল বৃদ্ধি হইতেছে; আমরা একটী উচ্চ স্থানে আশ্রয় লইয়া রহিয়াছি, গরু বাছুর প্রভৃতি স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, আমাদের আর বাঁচিবার আশা নাই।" এই সংবাদ পাঠ করিয়া বিহারীলাল হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। বিহারীলাল আর চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন না, তিনি বিজয়গোবি-

ন্দের বিপদের কথা শুনিয়া অবিলম্বে দক্ষিণসাবাজপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভবানীকান্ত বাবু জীবিত থাকিতে আর কুসুমের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না, কলিকাতায় ফিরিবেন না, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞাকে পোষণ করিয়া চলিলেন।

বিহারীলালের কলিকাতা পরিত্যাগের পর দিন দিন চিন্তামণির অন্তরে দারুণ বিচ্ছেদানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল, একদিকে ভবানীকান্ত বাবু অনুতাপে ও আত্মগ্লানিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে চলিয়াছেন, অন্য দিকে বিষাদের ভাবে মলিন ও শীর্ণ কুসুমকলিকা দিন দিন উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিতেছেন। কুসুমের সহায় মাত্র ঈশান; ঈশান কুসুমের বিপদসঙ্কুল জীবনের একমাত্র আশ্রয় হইবার জন্য যেন পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল! ঈশান দিনরাত্রি কুসুমকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিতেছে; কিন্তু নির্ব্বোধ কুসুম হাতে তুলিয়া বিষপাত্র চুম্বন করিয়া সংসারের মমতা একে একে ছিন্ন করিতেছেন, আর মনে মনে যেন বলিতেছেন,—"বিহারি, তোমার হৃদয় এত কঠিন, ইহা যদি জানিতাম, তবে আমি তোমাকে ভাল বাসিতাম না। তোমার জন্য মাতার আদেশকে তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়াছি, জীবনে মাতার মলিন মুখচ্ছবি তোমার মমতায় ভুলিয়াছি। হায়, আমি কি নির্ব্বোধ, পুরুষের মায়ায় ভুলিয়া আপন ধর্ম্ম ডুবাইলাম। আমার জননী আমার জীবনের সকলি যেন পূর্ব্বে জানিয়াছিলেন, না হলে "কুসুম বিবাহ করিও না," একথা কখনই বলিতেন না। বিবাহের ইচ্ছাই আমার জীবনের কালসর্প হইল!—যদি তাই হয়, তবে কেন আর বিহারীর মমতা হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি? কেন নিষ্ঠুর পুরুষের ভালবাসার মমতায় ভুলিয়া জীবনের সারবস্তু পরিত্যাগ করিতেছি? বিহারী কাপুরুষ, কেবল ভবানীকান্ত বাবুর মনোকষ্টের জন্য আমাকে নিষ্ঠুরের ন্যায় পরিত্যাগ করিল!! লোকে বলে, বিহারী সৎসাহসী, আমি বলি, বিহারী বালকের ন্যায় ভীত, নচেৎ মানুষের ভয়ে কখনই আমাকে বিসর্জ্জন দিত না।" এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে কয়েকদিন গত হইল। এদিকে ভবানীকান্ত বাবু লজ্জায় মৃত্যুর ক্রোড়ে আপন কলঙ্কমুখ লুকাইলেন,—চিরকালের মত সংসারের অনুতাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। ভবানীকান্ত বাবুর মৃত্যুর পর চিন্তামণি ঈশানকে আপন বাড়ীতে আনয়ন করিলেন। চিন্তামণি মনে মনে ভাবিলেন,—এইবার জীবনের আশা পূর্ণ

হইবে। এই প্রকার ভাবিয়া বিহারীলালের নিকট একখানি পত্র লিখিলেন; বিহারী পূর্ব্বেই সংবাদে ঠিকানা জানাইয়াছিলেন।

"প্রাণের বিহারি! বিধাতার প্রসাদে আজ প্রাণ খুলিয়া তোমাকে ডাকিয়া কৃতার্থ হইলাম। এতদিনে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে আমার জীবনের কন্টক অপসৃত হইয়াছে,—ভবানীকান্ত বাবু আমার পথ পরিষ্কার করিয়া সংসার হইতে পলায়ন করিয়াছেন; আমি এখন বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী, ভবানীকান্ত বাবু সমস্ত বিষয় বৈভব আমাকে দান করিয়া গিয়াছেন; এবং মৃত্যু সময়ে বলিয়া গিয়াছেন,—"কুসুম, আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দিলাম, তুমি বিহারী বাবুকে বিবাহ করিয়া সুখে জীবন কাটাইতে থাক,—আমি এত দিন তোমাদের সুখের কন্টক হয়েছিলাম, এত দিন পরে তোমাদের পথ পরিষ্কার করিয়া চলিলাম।" বিহারি, জীবনসর্ব্বস্ব, তোমার তুলনায় আমার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য নিতান্ত অসার বলিয়া বোধ হয়। এতদিন পরে তোমাকে পাইয়া কৃতার্থ হইব, এই আশায় কুসুম দিন দিন সজীব হইতেছে,—তোমার কুসুমের মলিন মুখ আবার প্রসন্ন হইয়াছে। বিহারি, এই পত্র পাইবামাত্র তুমি আমার নিকট আসিবে, মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবে না।" তোমারি—কুসুম।

এই পত্র খানি বিহারীলাল যখন পাইলেন, তখন তিনি বিজয়গোবিন্দের সংবাদ না পাইয়া এক প্রকার উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন। অস্বাভাবিক জলপ্লাবনে গৃহ, গরু বাছুর সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছে,— প্রায় সমস্ত অধিবাসীগণ প্লাবন-জলে প্রাণ হারাইয়াছে! হায়, সে বিষাদের কাহিনী কে লিখিতে পারে? পূর্ব্ব বাঙ্গালার ১২৮৩ সালের অস্বাভাবিক জল প্লাবনে দউলাত খাঁ প্রভৃতি স্থান শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, কত জনক জননী যে প্রাণের দায়ে সেই প্লাবনস্রোতে আপন হৃদয়ের অমূল্য রত্ন পুত্র কন্যাকে বিসর্জ্জন দিয়াছে, এবং তৎপরে আপনারাও সেই স্রোতের হাত হইতে রক্ষা না পাইয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার গণনা কে করিতে পারে? বিহারীলাল দক্ষিণ সাবাজপুরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, প্লাবনের জল কমিয়া গিয়াছে; কেবল স্তূপাকার মৃত মনুষ্যদেহ সমস্ত স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। পিতা পুত্র, জনক জননী, ভাই ভগ্নী, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব, শত্রু মিত্র, সকলেই মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইয়া কি ভীষণ দৃশ্যের দৃষ্টি করিয়াছে!! কেহ কাহারও জন্য দুঃখ করিতে নাই, সকলেই একদশাগ্রস্ত শৃগাল. কুকুর

পর্য্যন্ত মৃত শরীরের নিকটে নাই! এই ভীষণদৃশ্য দেখিয়া বিহারীলালের হৃদয় মন একবারে অস্থির হইল. তিনি গবর্ণমেন্টের লোকের সহিত মিলিত হইয়া বিজয়গোবিন্দ ও গিরিবালার মৃতদেহ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। ২।৩ দিনের মধ্যে সহস্র সহস্র মৃত শরীর দেখিলেন, কিন্তু বিজয় ও সহস্র গিরিবালার মৃত দেহ পাইলেন না। হায়, একবার বিজয়ের ছবিও বিহারী দেখিতে পাই-লেন না; যাহাকে দেখিবার জন্য সময় ও স্থানের দূরত্বকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। চতুর্থ দিনে গিরিবালার মৃত শরীর পাইলেন। অতি কষ্টে স্তূপাকৃত মৃত শরীর-রাশির মধ্য হইতে কুসুমের দেহ বাহির হইল। গিরিবালার দেহ দেখিয়া বিহারী উন্মত্তের ন্যায় হইলেন, বিহারীকে লক্ষ্য করিয়া যে লতিকাটী জীবিত ছিল, সেই গিরিবালার মৃত শরীর দেখিয়া যেন বিহারীর প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ইহার পর তিনি এক প্রকার আহার পরিত্যাগ করিলেন, সমস্ত দিন গবর্ণ-মেন্টের লোকের সহিত কেবল মৃতদেহ অনুসন্ধান করিতেন, কিন্তু কোন প্রকারেই বিজয়গোবিন্দের শরীর পাইলেন না। প্রায় ১২।১৩ দিনের মধ্যে সমস্ত স্থান পরিষ্কার হইয়া গেল, তিনি বিজয়ের দেহ না পাইয়া উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। এই দুরবস্থার সময় বিহারী চিন্তামণির পত্র পাইলেন। বিহারীলাল কষ্ট, দুঃখ ও যন্ত্রণার চিহ্নস্বরূপ নিম্নলিখিত পত্র খানি চিন্তামণির নিকট প্রেরণ করিলেন,—

'চিন্তামণি! তোমার পত্র পাইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।আমার চতুর্দ্দিক হইতে যেন বিপদ স্তূপাকৃত হইতেছে, বিজয়গোবিন্দ বয়সে আমার ছোট,—বাল্যকাল হইতে আপন সহোদরের ন্যায় বিজয়কে বক্ষে ধারণ করিয়া আসিয়াছি, সেই বিজয় অসময়ে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এদুঃখ আমার আর রাখিবার স্থান নাই। আমি জ্বলন্ত বিশ্বাস বলে দেখিতেছি, বিজয় পরম পিতার ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছে, কিন্তু তবুও আমার মন বুঝ মানে না। কুসুম, আমার শোক আমার বিশ্বাসের উপর জয়লাভ করিয়াছে, আমি বিজয়ের শোকে একেবারে অধীর হইয়া পড়ি-য়াছি। এই সময়ে আবার ভবানীকান্ত বাবুর মৃত্যু সংবাদ পাইলাম। তুমি মনে করিতেছ, ভবানীকান্ত বাবুর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে আমি সুখী হইব, কিন্তু তাহা তোমার ভ্রম। নানা কারণে আমি ভবানীকান্ত বাবুর মৃত্যুতে অস্থির হইয়াছি।

এই সময়ে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, মনে করিয়া তুমি আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি. কিন্তু কুসুম, তোমার মন এত অসারত্বে পরিপূর্ণ, ইহা আমি কখনও মনে করিতে পারি নাই। অবশ্য আমি তোমার ভালবাসার নিকট অবনত, কিন্তু তোমার হৃদয়ের অসার নীচ ভাবগুলিকে কখনই প্রশংসা করিতে পারি না। সংক্ষেপে বলিতে কি, তোমার সহিত আর আমার মিলনের সম্ভাবনা নাই,—ইহকালে নাই, পরকালেও নাই। আমি সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকট তোমার জন্য প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু কুসুম, তোমার সহিত আর কখনও যে মিলিব, সে আশা নাই। এখ নিদারুণ সংবাদ পাইয়া তুমি পুরুষ জাতিকে শত মুখে নিন্দা করিবে,—শত গালাগালি দিবে, কিন্তু কি করিব, আজ গুরুতর কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমার ভালবাসা ছিন্ন করিতে বাধ্য হইলাম। তুমি ভবানীকান্ত বাবুর মৃত্যুতে আহ্লাদিত হইয়াছ, আমি রমণী জীবনের এই অস্বাভাবিক ভাবকে কখনই হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি না।

তুমি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী হইয়াছ, কিন্তু আমার মনে হয়, ভবানী-কান্ত বাবুর বিষয় বৈভবে ধর্ম্মতঃ তোমার কোন প্রকার অধিকার নাই ; তুমি যদি উহা গ্রহণ কর, তবে তুমি ধর্ম্মের নিকট অপরাধিনী হইবে। আমি অনুরোধ করি, তুমি ঈশানের আশ্রয়ে থাকিয়া দীনভাবে ধর্ম্মের উপযোগিনী হইতে চেষ্টিত হও। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তুমি তাঁহার পাদপ্রান্তে আশ্রয় লাভ করিয়া উজ্জ্বল জীবন প্রাপ্ত হও, ইহাই প্রার্থনা। তুমি যখন তোমার স্বভাবের গুণে জগতের চক্ষুকে আকর্ষণ করিতে পারিবে, তখন কেঁহই তোমাকে ঘৃণা করিতে পারিবে না। আমি ইহার পর কোথায় যাইব, জানি না, ঈশ্বর তোমার মনে শান্তিবিধান করুন।"

তোমার ভালবাসায় মুগ্ধ—বিহারী।

এই পত্র পাইয়া চিন্তামণি কি প্রকার কাতর হইলেন, তাহা পাঠকগণ অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন। বিহারীর ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, চরিত্রবান লোকের অভাবে চিন্তামণির হৃদয়ে অনন্ত দুঃখের ভীষণ দংশন আরম্ভ হইল! চিন্তা-মণি বিহারীর আদর্শে জীবন্মৃতার ন্যায় দুঃখের বোঝা বহন করিতে ভবানী-কান্ত বাবুর বিষয় বৈভব সমস্ত ধর্ম্মের নামে উৎসর্গ করিয়া দরিদ্র ঈশানের কুটীরে যাইতেছেন, তাহা লিখিতে আর ইচ্ছা নাই। ঈশানই যেন অনাথা কুসুমের একমাত্র আশ্রয়দাতা। ঈশানের যত্নের ধন কুসুমের এই পরিণাম

স্মরণে ঈশান ব্যাকুলিত ও উৎকণ্ঠিত হইল; কিন্তু কি করিবে, চিন্তামণীর ভার অগত্যা সে লইল। সংসারের কুটিল চক্রে, এবং নৈসর্গিক ঘটনার অপরিহার্য্য ঘটনায় বিহারীর হৃদয় ছিন্ন হইল; বিহারী অধীর হইয়া জীবনের বাসনাকে একে একে ছিন্ন করিয়া চিরদিনের জন্য দেশত্যাগী হইলেন। কোথায় পলায়ন করিলেন, তাহা বিহারীর আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কেহই জানিলেন না। চিন্তামণি ঈশানের গৃহে বিহারীর স্বর্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দুবেলা তাহার পূজা ও সেবা সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বিহারী দেশত্যাগী হইয়াও অনাথা কুসুমের হৃদয়-রাজ্য হইতে পলাইতে পারিলেন না। বিহারী কুসুমের চির-পূজ্য, চির-আদরেরই রহিলেন। চিন্তামণির শেষ জীবনের সে মূর্ত্তি নিষ্কাম ব্রতের উজ্জ্বল পবিত্র মূর্ত্তি! তাহা দেখিলেও আনন্দ হয়। চিন্তামণির গভীর ভালবাসা কালে অনেকের নিকট আদর পাইল। চিন্তামণি দরিদ্রের সেবা, রোগীর শুশ্রূষা এবং বিহারীর পূজা করিয়াই জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইলেন।

সমাপ্ত।